জীবন বদলে যাবে

মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত

মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত

কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার রায়কোট দক্ষিণ ইউনিয়নের ডাকাতিয়া নদীর অববাহিকায় পূর্ব বামপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৮৭ সালের ২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ ডাঃ আবদুস সোবহান একজন পল্লীচিকিৎসক ও ব্যবসায়ী। চিকিৎসক পিতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কাজে মানুষের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন ব্যক্তিত্ব। মাতা আলহাজ রওশন আরা বেগম একজন গৃহিণী। চার ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ এবং ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় বেলটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পাশাপাশি তিনি মক্তবে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা লাভ করেন। মাদরাসায় শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সালে পূর্ব বামপাড়া মাদানীয়া দাখিল মাদরাসায় চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এর কিছুদিন পর মনতলী রহমানিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ফেনীর ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা থেকে মানবিক বিভাগে ২০০১ সালে দাখিল ও ২০০৩ সালে আলিম, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা থেকে ২০০৫ সালে ফাজিল ও ২০০৭ সালে কামিল(হাদিস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে তিনি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আরবি সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি এমফিল গবেষণারত।

www.nagorikpathagar.org

ফেনী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'মাসিক কিশোর পাতা'য় ২০০৩ সালে প্রথম কবিতা প্রকাশের মাধ্যমেই লেখালেখিতে হাতেখড়ি। সমসাময়িক বিষয়ে দৈনিক নয়া দিগন্ত, যুগান্তর, সংগ্রাম, যায়যায়দিন, ইনকিলাব, সাপ্তাহিক সোনার বাংলাসহ জাতীয় দৈনিকে বহু কলাম প্রকাশিত হয়েছে তার। এ ছাড়াও ছাত্র সংবাদ, নতুন কিশোরকণ্ঠসহ বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকী ও জাতীয় পত্রিকায় মানুষের জীবনাচরণ, নেতৃত্ব, সমসাময়িক বিষয়াবলি এবং ইসলামিক বিভিন্ন ইস্যুতে লেখালেখি করছেন নিয়মিত। এই বইয়ের অধিকাংশ লেখা তিনি কারাগারে থাকা অবস্থায় লেখেন। আওয়ামী সরকারের আমলে দুই দফা গ্রেফতার হয়ে ১৯ মাস কারাবরণ করেন। প্রথমবার গ্রেফতার হন ২০১১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয়বার ২০১৩ সালের ২৫ মে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়দীপ্ত কাফেলা, মেধাবী ছাত্রদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের আদর্শিক কার্যক্রমে আকৃষ্ট হয়ে ১৯৯৮ সালে এ সংগঠনে যোগ দেন তিনি। ফেনীতে পড়াকালীন সময়ে ২০০৩ সালে ছাত্রশিবিরের সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। ঢাকা আলিয়া ও মতিঝিল থানার দায়িত্ব পালন শেষে ২০১১ সালে ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় এইচআরডি সম্পাদক, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে তিনি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক ও ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন ২০১৬ সালে। ২০১৭ ও ২০১৮ সেশনে তিনি এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন এবং মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফাজিলকে ডিগ্রি এবং কামিলকে মাস্টার্সের সমমান আদায়ের আন্দোলনেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ২০০৮ সালে তিনি বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদের আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকের সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তার স্বপ্ন। তিনি সকলের দোয়াপ্রার্থী।

: fb.com/yasinarafathpage
: yasinarafath.du@gmail.com

প্রচ্ছদ: আলি মেসবাহ

www.nagorikpathagar.org

জীবন বদলে যাবে

মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত

আইসিএস পাবলিকেশন

www.nagorikpathagar.org

জীবন বদলে যাবে
মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত

প্রকাশনায়
আইসিএস পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১৮

প্রচ্ছদ
আলী মেসবাহ

ডিজাইন
মোজাম্মেল হক মজুমদার

গ্রন্থস্বত্ব
আইসিএস পাবলিকেশন

মূল্য
২০০ টাকা মাত্র (বোর্ড বাঁধাই)
৬০ টাকা মাত্র (নরমাল বাঁধাই)

ISBN : 978-984-34-4240-6

Jibon Bodlay jabe, By Mohammad Yasin Arafath.
Published By ICS Publication
Price tk.200.00 Only / US$ 6.00 (Board Binding)
tk.60.00 Only / US$ 2.00 (Normal Binding)

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা
আলহাজ ডাঃ আবদুস সোবহান
এবং
পরম শ্রদ্ধেয়া মা
আলহাজ রওশন আরা বেগম-কে
যারা আমাকে সব সময় প্রকৃত মানুষ হিসেবে
গড়ে ওঠার পথনির্দেশ করেছেন ।

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! শুকরিয়া আদায় করছি মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে যার একান্ত মেহেরবানিতে তরুণ যুবকদের উদ্দেশ্যে 'জীবন বদলে যাবে' শিরোনামে একটি বইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল (সা)-এর প্রতি যার জীবনাদর্শ সকলের জন্যই অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ। দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে জীবন উৎসর্গকারী সকলের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং জান্নাত কামনা করছি।

সাফল্য অর্জনের প্রতিযোগিতায় সবাই অবতীর্ণ। ব্যক্তি, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্র সবাই সাফল্য চায়। সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ভিন্নতা থাকলেও সাফল্য অর্জনের পদ্ধতি প্রায় একই। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাফল্য অর্জনে বিশ্বব্যাপী তরুণ যুবকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কেউ আদর্শিকভাবে সুনিদিষ্ট উপায়ে সাফল্য পেতে চায় আবার কেউ ছলে-বলে-কৌশলে যে কোন পদ্ধতিতে সফলতা পেতে চায়, জীবনকে বদলাতে চায়। আদর্শিকভাবে জীবনকে বদলানোর আদর্শিক পদ্ধতি আছে। যে পদ্ধতিগুলো জাগতিক উপায় উপকরণের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। পার্থক্য হল নিয়তের বা উদ্দেশ্যের। এই বইটিতে সাফল্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলোকে বর্ণনা করার ক্ষুদ্র প্রয়াস চালিয়েছি মাত্র। যারা সত্যকে ধারণ করে কল্যাণের পথে জীবনকে বদলাতে চান, যারা দুনিয়ার জিন্দেগির পাশাপাশি পরকালীন জিন্দেগিরও সফলতা প্রত্যাশা করেন বইটি বিশেষভাবে তাদেরই জন্য।

বইয়ের লেখাগুলো আমার বন্দিজীবনের সময়ে লেখা। ২০১৩ সালের ২৫ মে জীবনে ২য় বারের মত গ্রেফতার হই এবং দীর্ঘ ১৩ মাস কারাবরণ করি। কারাগারের সময়গুলোকে অলস না কাটিয়ে লেখালেখিতে মনোযোগ দেই। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে নেয়ার পর মূলত লেখালেখির সুযোগ পাই। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর চিত্রা বিল্ডিংয়ের

www.nagorikpathagar.org

১১ নং কক্ষে বসে মূলত এই লেখাগুলো লেখা। মুক্তিলাভের পরে এই লেখাগুলোকে আরো পরিমার্জন করে এবং তাতে তথ্য-উপাত্ত এবং কুরআন হাদিসের আরো রেফারেন্স যুক্ত করে মাসিক ছাত্র সংবাদ পত্রিকায় প্রতিমাসে একটি করে বিষয়ের উপর লেখা প্রকাশ করি।

সমাজের প্রচলিত বইগুলোতে সাফল্য অর্জন বা জীবন বদলানোর যে উপায় বলা আছে তাতে কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতি বিশেষ করে রাসূল (সা) এবং তার সাহাবাদের সফলতার উদাহরণগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অথচ রাসূল (সা) ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব। বইয়ের পরতে পরতে সাফল্যের শিখরে পৌঁছা মনীষীদের উদাহরণ তুলে ধরার পাশাপাশি মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বাণী এবং বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবাদের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাফল্যের ছোঁয়ায় জীবন বদলানোর প্রত্যাশীদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হয়েছে।

বইটিতে কুরআন হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) সহ বিভিন্ন মনীষীদের উদাহরণ তুলে ধরার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সতর্কতা সত্ত্বেও বইয়ের কোন অংশে তথ্য ও মুদ্রণজনিত বিভ্রাট থাকলে পাঠকদের কাছে সংশোধনের নিমিত্তে সহযোগিতা কামনা করছি, যা বইটির পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

বইটি লেখার ক্ষেত্রে কারাগারে থাকা অবস্থায় যারা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, মুক্ত হওয়ার পরে যারা বার বার এটি প্রকাশের তাগাদা দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ছাত্র সংবাদ পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি যারা আমার শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিমাসে আমার নিকট থেকে লেখা আদায় করে এই বইটি প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহর কাছে সকলের জন্য উত্তম জাযাহ কামনা করছি। তরুণ যুবকদের দুনিয়ার অর্জন আর পরকালীন সফলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার যে নেক উদ্দেশ্যে বইটি প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি মহান আল্লাহ সেই নেক মকছুদ পূরণ করুন। সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে গড়ে উঠুক আগামীর প্রজন্ম। বিনির্মাণ হোক ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত একটি সোনার বাংলাদেশ, সেই প্রত্যাশা করছি। আমিন।

আল্লাহ হাফেজ
মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত
ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৮

১. সংকল্প ১১

(১) মানুষ বড় হয় স্বপ্নের সমান
(২) প্রয়োজন দীপ্ত শপথ আর সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা
(৩) অদম্য ইচ্ছাশক্তি সাফল্যের সোপান
(৪) সাফল্যের জন্য চাই আত্মবিশ্বাস

২. পরিকল্পনা ২৪

(১) যদি লক্ষ্য থাকে অটুট
(২) প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার
(৩) হতাশা ঝেড়ে ফেলুন সম্ভাবনাকে সম্পদ মনে করুন
(৪) নেতিবাচক নয় ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন

৩. গতিশীলতা ৩৮

(১) জ্ঞানার্জন আর সাধনার বিকল্প নেই
(২) কথা ও কাজে ভারসাম্য রাখুন, কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী হোন
(৩) সাহস আছে যার সাফল্যের বিজয়মুকুট তার
(৪) জীবন বদলে যাবে

www.nagorikpathagar.org

৪. সময়ানুবর্তিতা ৫৪
(১) সময় হারিয়ে যাচ্ছে সময়েরই অন্ধকারে
(২) সাফল্য অর্জনে প্রয়োজন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা
(৩) সাফল্য অর্জনের অন্যতম চাবিকাঠি ধৈর্য
(৪) কুরআনের বাণী- সময়ের কসম, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত

৫. চারিত্রিক দৃঢ়তা ৭০
(১) চারিত্রিক দৃঢ়তা বয়ে আনে সফলতা
(২) মনের কথা মনে থাকে কি?
(৩) অহংবোধ : ঘুণে ধরা জীবনের প্রতিচ্ছবি
(৪) বিনয় নম্রতা ও সততা ধারণ করুন

৬. শৃঙ্খলা ৮৭
(১) শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা জীবন-সৌন্দর্যের নান্দনিক প্রতিচ্ছবি
(২) পরাভূত হতে না চাইলে রাগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্রোধ দমন করুন
(৩) অভিমান, অভিযোগ নয় সহানুভূতির দৃষ্টি প্রসারিত করুন
(৪) সদা হাস্যোজ্জ্বল থেকে আচরণে আন্তরিক হোন

৭. নির্ভরতা ১০৫
(১) প্রতিদিনের কর্মের আত্মপর্যালোচনা করুন
(২) আল্লাহকে যারা বেসেছে ভালো দুঃখ কি আর তাদের থাকতে পারে
(৩) সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব রাসূল (সা)-এর অনুসরণ করুন
(৪) পরকালীন সফলতাই প্রকৃত সফলতা

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

সাফল্যের ছোঁয়ায় জীবন বদলানোর স্বপ্ন দেখি আমরা সকলেই। আমাদের স্বপ্নগুলো যত বড় জীবন তত বড় নয়। তারপরও ছোট থেকে আমরা বড় হওয়ারই স্বপ্ন দেখি। প্রচলিত একটি কথা আছে, যার স্বপ্ন যত বড় তার অর্জনও তত বড়। আর স্বপ্ন দেখাতো দোষের কিছু নয়। জীবনের গতির সাথে স্বপ্নের গতিও বাড়ে। জীবনকে বদলানোর যে স্বপ্ন আমরা লালন করি সাফল্য অর্জনের ব্যর্থতায় সে স্বপ্নগুলো আলোর মুখ দেখে না। সাফল্য অর্জনের সাথেই জীবন বদলানোর সফলতা ব্যর্থতা জড়িত।

তবে সফলতাই জীবনের সবকিছু নয়। ছলে-বলে-কৌশলে আপনাকে সাফল্য অর্জন করতেই হবে, জীবনটাকে যেকোন মূল্যে বদলাতেই হবে এমনটি ঠিক নয়। এটি জাতীয় চরিত্রবিরোধী এবং সততা ও নৈতিকতার বিপরীত। আলবার্ট আইনস্টাইন (**Albert Einstein**) বলেছেন, "সফল মানুষ হওয়ার চেষ্টা করার চেয়ে নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো" জীবন একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, পরীক্ষার ক্ষেত্র। সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য আমরা নানাভাবেই চেষ্টা করি। কিন্তু পরিকল্পিত চেষ্টা না করার ফলে সফলতা আমাদের ধরা দেয় না। জীবনকে পাল্টে দেয়ার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতা প্রয়োজন। সেই সফলতার কতগুলো ধাপ আছে। ব্যক্তি জীবনে প্রতিটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। সফলতার জন্য সংকল্প, পরিকল্পনা, গতিশীলতা, সময়ানুবর্তিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা ও নির্ভরতা এই সাতটি বিষয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। এই সাতটি বিষয়ের সমন্বয়ে কৃতকার্য হয়ে সাফল্য ছিনিয়ে আনতে পারলেই সত্যিকার অর্থে জীবনটাকে বদলে দেয়া সম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

সফলতা অর্জনের প্রথম ধাপ সংকল্প। শুরুতেই যদি সাফল্য অর্জনের সংকল্প করা না হয় তাহলে সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। একটি সুন্দর স্বপ্ন লালন করা, দীপ্ত শপথ আর সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা, ইচ্ছা শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আত্মবিশ্বাস ধারণের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাই সংকল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ব্যক্তিকে শুরুতেই একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। পরিকল্পনা ছাড়া সফলতা আসে না। কেননা পরিকল্পনা কাজের অর্ধেক। পরিকল্পনা গ্রহণের সময় লক্ষ্যে অটুট থেকে, সকল হতাশাকে, হীনমন্যতাকে ঝেড়ে ফেলে সামনে এগুতে হয়। অনেক সময় সম্ভাবনা তুচ্ছ মনে করায় সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু সম্ভাবনাকে সম্পদ বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে সাফল্যের লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে অবশ্যই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূরে ঠেলে ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া জরুরি। সুন্দর স্বপ্ন আর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের পরই কাজে নেমে পড়তে হবে। আনতে হবে গতিশীলতা।

বর্তমান বিশ্ব জ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান। তাই জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি পরিশ্রম যদি ঢেলে দেয়া না হয় তাহলে সাফল্য অধরাই থেকে যাবে। ভলটেয়ারের মতে, "প্রতিভা বলতে মানুষের মুখ্য কোন জিনিস নেই বরং পরিশ্রম কর, সাধনা কর তাহলে সাফল্য তোমার পদচুম্বন করবেই" সফলতার জন্য কথা ও কাজে ভারসাম্য থাকতে হবে। বাধা বিপত্তির মোকাবেলায় সাহসী হতে হবে। সাহস সঞ্চার করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে কাজে গতিশীলতা আনতে পারলেই জীবনটাকে বদলে দেয়া সম্ভব। জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সময়ের সদ্ব্যবহার বা সময়ানুবর্তিতা। প্রতিটি দিন প্রতিটি মিনিট প্রতিটি সেকেন্ডই সাফল্য প্রত্যাশী ব্যক্তির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সময় একবার হারিয়ে গেলে তা কেয়ামত পর্যন্তও আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সময়ের কাজ সময়ের মধ্যেই করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা করে প্রয়োজনে কাজ এগিয়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ছাড়া যারা সময়ের মূল্য দিয়ে ভাল কাজ করেছে এবং ধৈর্যের মত মহৎ গুণ ধারণ করেছে। সফলতা ধৈর্যশীলদের জন্য অবধারিত।

জীবনকে কল্যাণের ধারায় সাফল্যের ছোয়ায় পাল্টে দিতে হলে কিছু চমৎকার গুণাবলী অর্জন করতে হবে আর কিছু খারাপ অভ্যাস বর্জন করতে হবে। এ জন্য চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিনয় নম্রতা ও সততাকে ধারণ করতে হবে। তার পাশাপাশি মস্তিষ্ককে অলস রাখা যাবে না। সার্বক্ষণিক ভাল কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

কারণ অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। অহংকার দাম্ভিকতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। কারণ অহংকার পতনের মূল। সাফল্যের জন্য জীবনের প্রতিটি ধাপে শৃঙ্খলা প্রয়োজন, প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন জীবন গঠন। জীবনবিধ্বংসী উপাদান রাগ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রোধকে দমন করতে হবে। অধীনস্থ বা সহযোগীদের প্রতি অভিমান, অভিযোগ নয় সহানুভূতির দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। সফলতার জন্য সদা হাস্যোজ্জ্বল থেকে আচরণেও আন্তরিকতা প্রয়োজন। এসব কাজের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নিজের প্রতিদিনের কাজের আত্মপর্যালোচনা করা। আত্মপর্যালোচনা ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করে এবং সঠিক পথে পরিচালিত করে। যেকোন কাজেই মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা করতে হবে। তারই কাছে সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা করার পাশাপাশি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব রাসূল (সা)-এর অনুসরণেই সাফল্যের মঞ্জিল খুঁজতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সফলতা সোনার হরিণ হলেও দুনিয়ার সফলতাই মূল সফলতা নয় বরং আখেরাতের সফলতাই চূড়ান্ত সফলতা এটি ধারণ করেই সাফল্যের পিছনে ছুটতে হবে। দুনিয়ার জিন্দেগিতে বড় বড় ডিগ্রি, বিশাল সম্মান অর্জন করলাম কিন্তু অবধারিত মৃত্যুর পরবর্তী জিন্দেগিতে জান্নাত অর্জন করতে না পারলে সকল অর্জনই বৃথা। জান্নাত উপযোগী জিন্দেগী গঠনই জীবন বদলে দেয়ার মূল সার্থকতা।

www.nagorikpathagar.org

সংকল্প

১. মানুষ বড় হয় স্বপ্নের সমান

সাফল্য ব্যক্তিজীবনের গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। জীবন কতটা সুন্দর তা নির্ভর করে অর্জিত সাফল্যের ওপর। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সাফল্যের আলাদা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। ছাত্রজীবনে ভালো রেজাল্ট করে কৃতিত্ব অর্জনের মধ্যে রয়েছে ছাত্রের সফলতা। আবার ব্যবসায়িক জীবনে ব্যবসায় সফল হওয়ার মধ্যেই রয়েছে ব্যবসায়ীর সফলতা– এভাবে চাকরি জীবন, রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন, খেলোয়াড়ি জীবন থেকে শুরু করে উঁচু-নিচু প্রত্যেক স্তরের কর্মতৎপরতায় সাফল্যের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ব্যক্তির জীবনে ভূমিকা রাখে। এইযে সাফল্যের এত গুরুত্ব সেই সাফল্য হঠাৎ করে অর্জনের কোনো বিষয় নয়। সুন্দর সাফল্য অর্জনের জন্য একটি সুন্দর স্বপ্নও থাকা চাই। যেই সুন্দর স্বপ্নকে আবর্তন করে মানুষ কর্মতৎপর হয়ে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছাতে পারে।

বলা হয়ে থাকে যিনি যত বেশি সুন্দর স্বপ্ন দেখেন, যত বেশি সেই স্বপ্নকে লালন করেন তিনি তত সুন্দর সাফল্য অর্জন করেন। যার স্বপ্ন নেই সাফল্যও তার জন্য অধরাই থেকে যায়। যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন না, স্বপ্নের পেছনে ছুটতে জানেন না, সাফল্যও তার পেছনে ছুটে না। আর যিনি সুন্দর স্বপ্ন দেখেন সেই স্বপ্নের পেছনে ছুটে বেড়ান, এক সময় স্বপ্নই তার পেছনে ছুটে তাকে সাফল্যের কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছতে অনুপ্রেরণা যোগায়। এজন্য সাফল্যের স্বপ্নচূড়ায় আরোহণের জন্য একটি সুন্দর স্বপ্ন লালন করা চাই। বিশ্বমানবতার অগ্রদূত

www.nagorikpathagar.org

জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কাফিরদের অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয় নিজ জন্মভূমি মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে আল্লাহরই নির্দেশে মদিনায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু নিজ জন্মভূমিতে ফেরার একটা স্বপ্ন রাসূল (সা) লালন করতেন। রাসূল (সা) কাবা জিয়ারত করার বাসনা করতেন। একদিন রাসূল (সা) তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি মক্কায় কাবাঘর জিয়ারত করছেন। ঘোরের মধ্যে দেখা স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে রূপ দিতে চাইলেন। মক্কায় গিয়ে কাবাঘর জিয়ারতের স্বপ্ন লালন শুরু করলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে ১৪০০ জন সাহাবী নিয়ে মক্কায় জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে মক্কায় কোরাইশকর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। সঙ্কট সমাধানের জন্য হজরত ওসমানকে (রা) পাঠালেন কোরাইশদের কাছে। কিন্তু সেখানে ওসমান (রা)-এর হত্যার রব ওঠে। সবাই ওসমান (রা)-এর হত্যার বদলা নেয়ার শপথ নেন। খবর পেয়ে কোরাইশরা হুদাইবিয়ায় সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়। সন্ধির আলোকে রাসূল (সা) সে বছর ফিরে আসেন এবং পরবর্তী বছর হজ করেন। পরবর্তীতে ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রাসূল (সা) তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন।

স্বপ্ন একটি পরীক্ষিত সত্য এবং বড় আশা জাগানিয়া শব্দ। স্বপ্ন শব্দটা খুব ছোট হলেও এর পরিধি যে কত বড় এবং কত ব্যাপক তা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়া স্বপ্নবাজ ব্যক্তিদের উপলব্ধি না করলে বোঝা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে আমাদের সারাদিনের কাজকর্মের ব্যতিব্যস্ততার যে দৃশ্যপট, সেগুলো ব্রেনে লোড হিসেবে জমা হতে থাকে। এই লোডগুলোকে অফ লোড করার একটি জৈবিক প্রক্রিয়া হচ্ছে স্বপ্ন, যা আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পাই। কিন্তু বাস্তবিক স্বপ্ন কি সে সম্পর্কে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও খ্যাতিমান পরমাণু বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালাম বলেছিলেন "স্বপ্ন তা নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন হচ্ছে তা-ই, যা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না" অর্থাৎ শয়নে, স্বপনে, জাগরণে যে লক্ষ্যের অনুরণন আপনাকে আমাকে কর্মব্যস্ত করে রাখে তা-ই হলো স্বপ্ন। এই স্বপ্ন দেখে যারা পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন, তারা তাদের স্বপ্নটাকে বিশাল করেছেন, সুন্দর করেছেন পরিশ্রমের মাধ্যমে, রক্তকে ঘামে পরিণত করার মাধ্যমে। আর এর ফলেই তাদের সুন্দর স্বপ্নগুলো অঙ্কুরিত হয়েছে সাফল্যের বীজে।

'মানুষ বড় হয় তার স্বপ্নের সমান'। 'সফল মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগে অধিকাংশ বিষয়ই তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সময় তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায় লক্ষ্য অর্জনের পথে।' সত্যিকারার্থে সাফল্য অর্জন করতে হলে স্বপ্ন দেখতে হবে, বড় স্বপ্ন, সুন্দর স্বপ্ন। আপনি কতটুকু ছোট তার হিসাব না করে আপনি কত বড়, কত সুন্দর স্বপ্ন দেখতে পারেন তার হিসাব করুন। বিশ্বের সব

www.nagorikpathagar.org

বিখ্যাত মানুষ সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়নি। এসব সফল মানুষের অনেকেরই জন্ম হয়েছে দরিদ্র পরিবারে। লড়তে হয়েছে অভাবের সঙ্গে, নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে। এদের অনেকেই কাজ করেছেন পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কাঠুরিয়া, মুচি কিংবা মুদি দোকানদার হিসেবে। দিনযাপন করেছেন ফুটপাথে। কিন্তু শুরুটা যে কর্মেই হোক না কেন, তাদের ছিল লক্ষ্য আর দু'চোখে ছিল বড় হওয়ার সুন্দর স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের পথে অবিচল থাকার কারণেই তারা সাফল্যের উচ্চশিখরে পৌঁছাতে পেরেছেন।

এক কাঠুরিয়ার ছেলে স্বপ্ন দেখেছিল সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে। কিন্তু লোকজন তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও কাঠুরিয়ার ছেলের সেই স্বপ্ন সত্যিই পূরণ হয়েছিল। তিনি আর কেউ নন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আবরাহাম লিংকন। স্বপ্ন লালন করে এগিয়ে যাওয়ার ফলেই তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন। কাঠুরিয়ার ছেলে হয়েও দমে যাননি তিনি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইরিশ ব্যক্তি জর্জ বার্নার্ড শ মাত্র ৫ বছর স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। দরিদ্রতার কারণে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাকে কেরানির কাজ করে অর্থ জোগাড় করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে তিনি একদিন বড় লেখক হবেন। তাই তিনি কাজের ফাঁকে প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে ১০ পৃষ্ঠা পড়তেন। কোন কারণে পড়তে না পারলে পরের দিনের সাথে মিলিয়ে মোট ২০ পৃষ্ঠা পড়তেন। একদিন তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল। আর তিনি সেই সাহিত্যেই পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী কিংবদন্তি নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। ম্যান্ডেলার বাবা যখন মারা যান, তখন তিনি ছিলেন নয় বছরের শিশু। এরপর মা ম্যান্ডেলাকে নিয়ে কুনু গ্রামে চলে আসেন। ক্ষুদ্র একটি কুটিরে বসবাস করতেন। কোনোরকমে শাকসবজি খেয়ে জীবনধারণ করতেন। তখন কে ভেবেছিল, এই ছোট্ট ছেলেটিই একদিন বিশ্বব্যাপী কিংবদন্তি হয়ে উঠবে! নেলসন ম্যান্ডেলা ২৯ বছর কারাবন্দী ছিলেন। এমন প্রকোষ্ঠে তাকে রাখা হলো যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতো না। মুক্তির পর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি সেখানে কী করেছেন? তিনি উত্তর দিয়েছেন, 'স্বপ্ন দেখেছি'। মুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার স্বপ্ন দেখেছি। সত্যিই তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করেছেন।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ) ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ইমাম আবু হানিফার দাদা ছিলেন একজন ইরানি ক্রীতদাস। তার পিতা একজন সামান্য কাপড়ের ব্যবসায়ী থেকে একজন সওদাগরে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি তার পুত্র আবু হানিফার মেধাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তাকে ব্যবসায়ে না লাগিয়ে উচ্চশিক্ষা দানে মনোযোগী হন। কারণ তখন থেকেই তিনি স্বপ্ন

www.nagorikpathagar.org

দেখেছিলেন আবু হানিফা বড় জ্ঞানী হবে, মুসলিম উম্মাহর জন্য অবিসংবাদিত ব্যক্তি হবে। সেই থেকেই আবু হানিফার পথচলা। খুব অল্প বয়সেই ইমাম আবু হানিফা কুরআনে হাফেজ হন। আরবি ভাষাসাহিত্যে অর্জন করেন অসামান্য দখল। তিনি জ্ঞানের তুলনায় ধনসম্পদ বা পদবিকে কোনোই গুরুত্ব দিতেন না। তার সুনাম শুনে কুফা নগরীর স্বেচ্ছাচারী গভর্নর ইবনে হুরায়রা তাকে কুফার কাজির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। কিন্তু জ্ঞানের পাগল আবু হানিফা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ইমাম আবু হানিফা (রহ) মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স বা ফিকাহশাস্ত্র তৈরি করেন। মশহুর জার্মান পন্ডিত ভনক্রেমার বলেছেন, এটি ইসলামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধির ধারণাতীত ফল।

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মানবতার মহান শিক্ষক জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্মের ৬ মাস আগেই পিতা আবদুল্লাহকে হারিয়েছেন। ছয় বছর বয়সে হারিয়েছেন মা আমেনাকে। লালিত পালিত হয়েছেন দুধমাতা হজরত হালিমা সাদিয়া (রা)-এর কোলে। ৮ বছর পর হারিয়েছেন দাদা আবদুল মোত্তালিবকে। ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কারণে তায়েফে কাফেরদের পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন। হত্যার জন্য কোরাইশরা বহুবার চেষ্টা করেছে। নিজ জন্মভূমি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাঁকে। মদিনায় আক্রমণের শিকার হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। ওহুদের ময়দানে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে। এত কিছুর পরও রাসূল (সা) সফল ব্যক্তি। তিনি দ্বীনের পূর্ণতা তথা বিজয়ের স্বপ্ন থেকে একচুল পরিমাণ পিছপা হননি। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তিনি গোটা দুনিয়ায় ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করেছেন। তাইতো মহাগ্রন্থ আল কুরআনে রাসূল (সা)-এর জীবনাদর্শকেই অনুকরণীয় সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ" (সূরা আহজাব : ২১)।

২. প্রয়োজন দীপ্ত শপথ আর সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা

সুন্দর স্বপ্ন লালন করে সাফল্যের পেছনে ছুটে চলার ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রয়োজন হলো দীপ্তশপথ আর সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। দীপ্তশপথ হচ্ছে কাজের সফলতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া আর সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে শপথ বাস্তবায়নের চালিকাশক্তি; যে আকাঙ্ক্ষার ওপর ভর করে দীপ্তশপথে বলীয়ান হয়ে সাফল্যের পেছনে পূর্ণোদ্যমে ছুটে চলা যায়। সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিশ্রুতি বা শপথ রক্ষার ইচ্ছাও বলা চলে। শপথহীন কাজে খাদ থেকে যায়। মনোবাসনা হয় দুর্বল এবং এর ভবিষ্যৎ হয় অনিশ্চিত। কেউ কেউ আছেন শপথবদ্ধ হতে চান না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে শপথবদ্ধ হওয়া ছাড়াওতো বহু কাজ করা যায়, বহু কাজে সফলতা

www.nagorikpathagar.org

অর্জন করা যায়। এদের অনেকে মনে করেন শপথবদ্ধ হওয়া মানে নিজেকে অঙ্গীকারের জালে জড়িয়ে ফেলা, নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেয়া, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা। আসলে বাস্তবিক কথা হচ্ছে এটা তারাই ভাবেন যারা সাফল্য অর্জনে সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না এবং দীপ্তশপথেও বলীয়ান হন না। যদি দীপ্তশপথে বলীয়ান হয়ে সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা লালন করে কাজ শুরু করা যায় তাহলে সাফল্য ছিনিয়ে স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বলেছেন, "যারা সুদৃঢ়প্রত্যয়ী তারাই সফলকাম" হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার সংবাদে বাবলা গাছের নিচে রাসূল (সা)-এর হাতে হাত রেখে যেসকল সাহাবী শপথ গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর অনেক বেশি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে এসেছে- "হে রাসূল (সা) আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট বাইআত তথা শপথবদ্ধ হচ্ছিল" (সূরা ফাতাহ: ১৮)।

আমাদের সাফল্য দীপ্তশপথ আর সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা পোষণের সাথে গভীরভাবে জড়িত। দীপ্তশপথ আর সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা তথা অঙ্গীকারবদ্ধতা কাজের ক্ষেত্রে শক্তি জোগায়। যখন কোন ব্যক্তি সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দীপ্তশপথে বলীয়ান হয় তার মনে এ ধারণাই জন্মে, যাই ঘটুক না কেন, যে যাই বলুক না কেন, সাফল্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত থেমে থাকা নয়। রাসূল (সা) প্রতিটি যুদ্ধের আগেই সাহাবাদের বাইআত তথা শপথবদ্ধ করাতেন। বদর যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন প্রায় নিরস্ত্র সৈন্য ১ হাজার সশস্ত্র কোরাইশ সৈন্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় মূল প্রতিপাদ্য ছিল তার মধ্যে শপথবদ্ধতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বদরের সাহাবারা বাইয়াতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সাফল্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা থেমে যাবেন না। যিনি দীপ্তশপথ নিয়ে সাফল্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পারেন সাফল্য তার পদ চুম্বন করবেই। যিনি শপথবদ্ধ হন তিনি অনেক কিছুই ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তার ত্যাগের এই মানসিকতাই তাকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা লালন করা ব্যক্তি কাজের ক্ষেত্রে যখন সমস্যা আসে তার সূচনাতেই পালিয়ে যায় না, হতাশ হয় না বরং দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা তাকে সকল প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়েও বিজয়ী করে। আর যিনি শপথবদ্ধ হন না তিনি যে কোন সময় মূল কাজ থেকে ছিটকে পড়তে পারেন। ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, ক্ষুধা-দরিদ্রতা, চিন্তার অসারতা তাকে যেকোন সময় সাফল্য অর্জনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে।

আমাদের সমাজে যারা প্রতিনিধি নির্বাচিত কিংবা মনোনীত হন তাদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। শপথবাক্য পাঠ করানোর মাধ্যমে তার দায়িত্ব এবং

www.nagorikpathagar.org

কর্তব্যের ব্যাপারে তাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করা হয়। শপথবদ্ধ ব্যক্তি যিনি শপথের মাধ্যমে অধীনস্থদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হন তার জবাবদিহিতা আর শপথহীন ব্যক্তির জবাবদিহিতা সমান নয়। কারণ শপথবদ্ধ ব্যক্তিকে শপথের আলোকেই কর্তব্য পালন করতে হয়। সমাজে যিনি যত গুরুত্বপূর্ণ তার শপথও তত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখি সংসদ সদস্য হিসেবে যিনি শপথ নেন তিনি যদি মন্ত্রী বা স্পিকার হন তাকে তখন আবারো শপথ নিতে হয়। বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনায় শপথ ভঙ্গের জন্য আইনি শাস্তির ব্যবস্থার বিধানও সকল দেশেই সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। এতেই প্রতীয়মান হয় শপথের গুরুত্ব কত বেশি। রাষ্ট্র পরিচালনায় বা কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বা কাজের সফলতার জন্য যদি শপথ বা অঙ্গীকারের গুরুত্ব থাকে তাহলে আমরা যারা জীবনটাকে সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে বদলে দিয়ে সাফল্য ছিনিয়ে আনতে চাই তাদের দীপ্তশপথ আর সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ধারণ করা অনেক বেশি জরুরি।

৩. অদম্য ইচ্ছাশক্তি সাফল্যের সোপান

মানুষের ভেতর এক বিশাল শক্তি লুকিয়ে আছে যার নাম ইচ্ছাশক্তি। যে শক্তি অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার। এই অফুরন্ত ইচ্ছাশক্তিকে যদি সত্যিকারার্থে জাগ্রত করা যায় তাহলে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে হলেও বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। অদম্য ইচ্ছাশক্তি সাফল্যের অন্যতম সোপান। অদম্য, অজেয় ইচ্ছাশক্তি যার রয়েছে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা তারই সবচেয়ে বেশি। সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছার জন্য প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করা। কিন্তু অনেক সময় মানুষ তার ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করে না। নিজের ভেতরের ইচ্ছাশক্তিকে নিজের মাঝেই ঘুম পাড়িয়ে রাখে। নিজেকে ছোট মনে করে। না পারার ভয়কে জাগ্রত করে রাখে। অথচ নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে যদি জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে যেকোনো সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে, **Where there's a will, there's a way** অর্থ- ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। সেই আদিকাল থেকেই এ প্রবাদ বাক্যটা মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে। ছাত্রছাত্রীরাও তাদের খাতায় এ বিষয়ে অসংখ্যবার ভাবসম্প্রসারণ লিখেছে। শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে এ বিষয়ে প্রতিনিয়তই পাঠদান করে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো ইচ্ছা নামক এই অফুরন্ত শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে লুকিয়ে থাকলেও তার ব্যবহার সব সময় লক্ষ করা যায় না। ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করে জীবন পরিচালনার উপায় তথা কাজের সাফল্যে পৌঁছার কোনো তৎপরতা অনেকের মাঝেই অনুপস্থিত থাকে। যদিও সঠিকভাবে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করা এবং সে ইচ্ছাকে শেষ পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

ধরে রাখা সত্যিই কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে মানুষ পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

ইচ্ছা করলেই মানুষ অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েও সাফল্যকে ছিনিয়ে আনতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন নিজেকে দুর্বল না ভাবা, আত্মবিশ্বাস রাখা, ব্যর্থ হওয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা। নিজের মাঝে যে বিশাল ইচ্ছাশক্তি লুকিয়ে আছে এর ওপর অনেকেরই বিশ্বাস নেই। অনেকেই ভাবেন 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়' কথাটি তার জন্য প্রযোজ্য নয়। যারা নিজের জন্য ইচ্ছাশক্তি প্রযোজ্য নয় বলে আলসেমি করেন তারা মূলত তার ভেতর লুকিয়ে থাকা অফুরন্ত শক্তিটাকেই তিলে তিলে শেষ করে দেন, ধামাচাপা দিয়ে রাখেন। অথচ ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে ফলাফল বের করে নিয়ে আসা সম্ভব।

ইচ্ছাশক্তির বলে প্রতিবন্ধকতার পাহাড় মাড়িয়ে অনেকেই সাফল্য ছিনিয়ে এনেছেন। আমাদের চারপাশেই এ রকম হাজারো উদাহরণ আছে। ২০১৪ সালে এইচএসসি-তে এক অন্ধ ছেলের গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার খবরে দেশব্যাপী আলোড়ন তৈরি হয়। প্রশ্ন উঠে জন্মান্ধ ছেলেটি কিভাবে এমন সাফল্য অর্জন করতে পারল। জানা গেল ছেলেটি চোখে না দেখলে কী হবে, তার মমতাময়ী মা তার বইয়ের পড়াগুলো মোবাইলে রেকর্ড করে রাখতেন, আর সে মোবাইলের রেকর্ড শুনে পড়া মুখস্থ করত। যে প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এইচএসসি ফাইনাল পরীক্ষায় সে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে গেল। এটি মূলত তার ইচ্ছাশক্তির কারণেই সম্ভব হয়েছিল। ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকলে শুধু চোখের প্রতিবন্ধকতা কেন যেকোনো প্রতিবন্ধকতাকেই জয় করা সম্ভব। এমনই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার হজরতপুর গ্রামের কৃষক জাহিদ সরওয়ারের ছেলে জুবায়ের হোসাইন। মুখে কলম নিয়েই লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে সে। জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী জুবায়ের হাত-পা কাজে লাগাতে না পারায় মুখেই কলম তুলে নেয়। খাতায় লেখালেখি শিখতে বছরখানেক সময় লাগলেও সে এখন স্বাভাবিক মানুষের মতো লিখতে পারে। জুবায়ের প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পেয়েছিলো জিপিএ ৪ দশমিক ২৫। জেএসসিতে সে জিপিএ ৫ পায়।

অনেক সময় আমরা ইচ্ছাশক্তির অভাবে নানান ধরনের হতাশা, দুশ্চিন্তা ও মানসিক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ি। যার ফলে কাজে চলে আসে অনীহা। কাজ করার সময়, বাধাবিপত্তির সময় ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল রাখুন, ইচ্ছাশক্তিকে স্থায়ী করার চেষ্টা করুন। কারণ কাজের ইচ্ছা নির্ভর করে কাজের প্রতি আগ্রহের ওপর। কতটা আগ্রহের সাথে কাজ করছেন তার ওপরই নির্ভর করে আপনার

www.nagorikpathagar.org

ইচ্ছা কতক্ষণ স্থায়ী হবে। মানুষের ইচ্ছাশক্তি বাড়ানোর উপায় বের করতে গবেষকরা বিস্তর গবেষণা করেছেন। পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইচ্ছাশক্তি একটি পেশির ন্যায়, যা বেশি কাজ করার দরুন ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সে ক্লান্তিকে পূরণ করতে পরিমিত খাদ্য দরকার হয়। গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে দেহের অন্যান্য পেশির মত ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতাও বাড়ানো সম্ভব।

সুস্থ ও শারীরিকভাবে ভালো থাকার অন্যতম মন্ত্র হলো নিজের ইচ্ছে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় হতাশা, দুশ্চিন্তা ও মানসিক রোগ থেকে মুক্তির অন্যতম মন্ত্র হলো নিজের প্রতি নিজের ইচ্ছে। যার ফলে নিজের ভবিষ্যৎ, ক্যারিয়ার, স্মৃতিশক্তি ও দক্ষতা বাড়াতে মূলমন্ত্র শক্তি হিসেবে কাজ করবে। আপনি হয়ে উঠবেন আগের থেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও সুস্থ। ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকলে যেকোনো প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা সম্ভব। আমরা যারা খারাপ রেজাল্ট করি, তারাও খুব হতাশায় ভুগে থাকি। এর কারণ ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী না করা। ছোট বড় সবাই কিছু না কিছু নিয়ে হতাশাতে ভুগছি। হতাশা এক ধরনের মানসিক রোগ। আর আপনি এই রোগে যদি আক্রান্ত হয়ে পড়েন, তাহলে আপনি সাফল্য অর্জনের লক্ষ্য থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাবেন। সাফল্য অর্জন তো করতেই পারবেন না, যা অর্জনে থাকবে তাও হারাবেন। যার মধ্যে ইচ্ছাশক্তি থাকে হতাশা তাকে কখনও কাবু করতে পারে না।

ইচ্ছাশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ অধ্যবসায়ে হয়েছে মনোযোগী, পেয়েছে চিত্তের একাগ্রতা, যা মানুষকে তার সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। ইচ্ছাশক্তি মানুষের মনোবলকে দৃঢ় করে এবং কাজে সাফল্যের রসদ জোগায়। ইচ্ছা না থাকলে এক ধরনের জড়তা কাজ করে মানব-হৃদয়ে। ফলে কোনো আকাঙ্ক্ষাও জাগে না। ইচ্ছাশক্তি প্রচণ্ড শক্তিশালী হলে যেকোনো বাধা তার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পৃথিবী জয় করার প্রবল ইচ্ছা থেকে নেপোলিয়ন ইউরোপ জয় করেছিলেন, আবরাহাম লিংকন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হতে পেরেছিলেন। স্বাধীন হওয়ার তীব্র ইচ্ছা থেকেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। তাই ইচ্ছাশক্তিই মানুষের কাজের ও সাফল্যের মূল শক্তি। ইচ্ছাহীন জীবন অর্থহীন। ইচ্ছা থেকেই প্রয়োজনের সৃষ্টি হয় আর প্রয়োজন থেকেই বের হয় সাফল্য পাওয়ার উপায়। তাই ইচ্ছাকে সাফল্যের মূলমন্ত্রও বলা হয়।

কেউ কেউ বলে থাকেন, মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই যেহেতু সবকিছু হয়ে থাকে তাহলে ব্যর্থতার পেছনে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার দায় কোথায়! এখানে সবচেয়ে

www.nagorikpathagar.org

বড় যে ভুলটা সাধারণত হয় তা হলো, আল্লাহর ইচ্ছাকে মানুষের ইচ্ছার মতো কিছু একটা বিবেচনা করা। বস্তুত আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে আমাদের জন্য মূল শক্তি, যেই শক্তির বলে আমরা ইচ্ছা করতে পারি। আর আমরা তখনই কেবল ইচ্ছা করতে পারি যখন "আল্লাহর ইচ্ছা" আমাদেরকে ইচ্ছা করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। এ ক্ষেত্রে একটি ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। মনে করুন আপনি কোনো পাওয়ার স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ নিচ্ছেন এবং সেই বিদ্যুৎ আপনি ইচ্ছামত বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছেন। এখানে বিদ্যুৎ কাজে লাগানোর জন্য আপনি পাওয়ার স্টেশন যিনি চালাচ্ছেন তার ইচ্ছার অধীন। কিন্তু বিদ্যুৎ কোন খাতে ব্যবহার করবেন সেটা আপনার ইচ্ছাধীন। বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার কিংবা অপব্যবহারের দায় আপনার।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন, "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেন না। সে যা ভালো কাজ করেছে তার ফল পাবে এবং যা খারাপ করেছে তা তার বিরুদ্ধে যাবে" (সূরা আল বাকারা: ২৮৬)। হজরত আলী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ বেহেশতে ও দোজখে প্রত্যেক ব্যক্তির স্থান পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। লোকেরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমরা কি আমল করা ছেড়ে দেবো এবং পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ করে রাখা বিষয়ের ওপর ভরসা করে বসে থাকব? রাসূল (সা) বললেন, কেন থাকবে? যে ব্যক্তিকে যে স্থানের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সেই কাজ সহজ করে দেবেন। সৎ ব্যক্তির জন্য সৎকাজ করা সহজ হয়ে যাবে। বদ ব্যক্তির জন্য বদকাজ করা সহজ হয়ে যাবে। (বুখারি ও মুসলিম)

৪. সাফল্যের জন্য চাই আত্মবিশ্বাস

আত্মচেতনার উজ্জীবনী শক্তির নাম আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক শক্তি। ব্যক্তিজীবনে প্রতিটি কাজের জন্য এ শক্তি প্রয়োজন। সফল হতে হলে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। যার আত্মবিশ্বাস যত বেশি, জীবনের সব ক্ষেত্রে তার সফলতা তত বেশি। আত্মবিশ্বাস মানুষের এমন এক শক্তি যা কাজের ক্ষেত্রে, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বাড়তি প্রেরণা জোগায়। এটি ব্যক্তিকে আলাদা শক্তি জোগায়, সাহস জোগায়, হীনমন্যতা দূর করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে দৃঢ় থাকতে সহায়তা করে। মনের মধ্যে জমে থাকা যেকোনো ধরনের হীনমন্যতা, সঙ্কীর্ণতা ও হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হতে পারলে সাফল্য ধরা দেবে হাতের মুঠোয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন, "যে সকল লোক

www.nagorikpathagar.org

স্বীয় মনের সঙ্কীর্ণতা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল শুধু তারাই সফলকাম" (সূরা তাগাবুন : ১৬)।

আত্মবিশ্বাস হলো জীবনে সফল হওয়ার মূলমন্ত্র। আত্মবিশ্বাসী না হলে জীবনে সফল হওয়া যায় না। জীবনে চলার পথে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে। কিন্তু যারা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, তারা সহজে হাল ছাড়ে না। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত চলতেই থাকে তাদের সংগ্রাম। যত বাধাই আসুক কিছুই তাদের থামিয়ে রাখতে পারে না। নিজের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, জীবনবোধের প্রতি গভীর আস্থাই আত্মবিশ্বাস। সাফল্য অর্জন আর জীবনকে আনন্দময় করতে আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় রেখে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিদিনের নানা ব্যস্ততার সাথে তাল মিলিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। এই এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা বা শক্তি জোগায় আত্মবিশ্বাস।

আত্মবিশ্বাসকে সাফল্য অর্জনের হাতিয়ার বলা হয়। এই হাতিয়ার ছাড়া জীবনে সফলতা বয়ে আনা অত্যন্ত দুরূহ। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হলে জীবনে সফলতা আসবে, আলোর মুখ দেখবে, জীবন থেকে অন্ধকার দূরীভূত হবে। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা রয়েছে। জীবনে চলার পথে দুঃখ-বেদনা আসবে, জীবনের গতিকে রুদ্ধ করবে কিন্তু এসবের মাঝেও আত্মবিশ্বাস মানুষকে শক্তি জোগাবে। মনের মধ্যে সকল প্রকার জড়তা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কুচিন্তা, কুপ্রবৃত্তি দমন করে আত্মবিশ্বাসী হলে তখন সে সফল হবেই। এ পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছেন, পৃথিবীকে মহান কিছু দিতে পেরেছেন তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। পৃথিবীতে যারা মহান, স্মরণীয়-বরণীয় তাদের প্রত্যেককেই আত্মাবিশ্বাস পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের সুউচ্চ শিখরে।

পৃথিবীতে যারা শ্রেষ্ঠ হয়েছেন তারা নিজেদের ওপর বিশ্বাসী ছিলেন বলেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হয়েছেন। কখনো দেখা যায় নিজের ওপর নিজের বিশ্বাস যখন হারিয়ে যায় তখন একজন মানুষের আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তির ভিত্তি হয় দুর্বল। তখন শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাস প্রসারে সাহায্য করে। আত্মবিশ্বাস সকল বাধা-বিপত্তিকে দূর করে দিয়ে জ্ঞানের নান্দনিক পরিশীলনের সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। সাথে যোগ করে দেয় প্রেরণা, যে প্রেরণা সাফল্যকে করায়ত্ত করতে সহায়তা করে। ব্যক্তির সকল যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে। ব্যক্তি অনেক বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু তার আত্মবিশ্বাসহীন পথচলা তার সাফল্য অর্জনকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় সব ঠিকঠাক থাকলেও আত্মবিশ্বাসের অভাবে সাফল্য

www.nagorikpathagar.org

হাতছাড়া হয়ে যায়। ক্রিকেট খেলার মাঠে আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তি যত ভালো খেলোয়াড়ই হোন না কেন ভালো পারফরম করতে পারেন না। মাঝে মধ্যে দেখা যায় খুব জাঁদরেল ব্যাটসম্যানও সাধারণ একটি বলে আউট হয়ে যান। তখন ধারাভাষ্যকার বলতে থাকেন, ব্যাটসম্যান এই শটটি আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলেননি তাই আউট হয়ে গেছেন।

আত্মবিশ্বাস একটি জাতির উন্নতির সোপান। যে জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস নেই সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। যে জাতি স্বভাবগতভাবেই আত্মবিশ্বাসহীন সে জাতি সবসময়ই দুর্বলই থাকে, উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না। যে জাতির স্বভাব-প্রকৃতিতে হীনমন্যতা আসন গেড়ে বসে, সে জাতি উন্নতি করবে কিভাবে আর কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তার আত্মমর্যাদা! সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর 'সুচিন্তা' নামক গ্রন্থের 'আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "সিংহশাবক যে ভেড়া না হইয়া সর্বদাই সিংহ হয়, সে তাহার বিশ্বাসের গুণেই। আর মেষশাবক যে, সিংহশাবক না হইয়া মেষ হয়, সেও তাহার বিশ্বাসের গুণে"

আত্মবিশ্বাসের সাথে যদি সাহস যোগ হয় তাহলে সত্যিকার সফলতা পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে সমগ্র আরবে ভণ্ড নবীদের উৎপাত শুরু হয়। এসময় ভণ্ড নবী মোসায়লামা আল কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে মোসায়লামার বাহিনী ধাওয়া খেয়ে উদ্যানে ঢুকে ফটক বন্ধ করে দেয়। প্রখ্যাত সাহাবী বারা ইবনে মালিক (রা) মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠে বলেন, "ওহে জনমণ্ডলী! আমি বারা ইবনে মালিক, তোমরা আমাকে উদ্যানের অভ্যন্তরে তাদের মাঝে ছুড়ে মারো" লোকেরা বলল, "না, তা কেমন করে হয়" বারা বললেন, "আল্লাহর কসম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা আমাকে ভেতরে ছুড়ে মারলে আমি অবশ্যই ফটক খুলে দিতে পারব" অতঃপর তাকে উঁচু করে প্রাচীরের ওপর তুলে ধরা হলো। তিনি উঁকি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই মোসায়লামা বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফটকের মুখেই প্রচণ্ড লড়াই হলো। তিনি ফটকের দরজা খুলে দিতে সক্ষম হলেন। অপেক্ষমাণ মুসলিম সৈন্যরা মুহূর্তেই উদ্যানে প্রবেশ করে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলো। অভিশপ্ত মোসায়লামা নিহত ও তার বাহিনী পরাজিত হলো। বারা ইবনে মালিক (রা)-এর দেহ আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। তীর, বর্শা ও বল্লমের আশিটিরও বেশি আঘাত লাগে তাঁর শরীরে। এক মাস পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। বারা ইবনে মালিক (রা)-এর সেদিনের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর সাহস গোটা মুসলিম বাহিনীকে ভণ্ড নবী মোসায়লামা বাহিনীর বিরুদ্ধে সাফল্য এনে দিতে সাহায্য করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

আত্মবিশ্বাস যাদের কম তাদের সাফল্যও কম। প্রকৃত আত্মবিশ্বাসী মানুষের সাথে কম আত্মবিশ্বাসী মানুষের তাইতো ব্যবধান অনেক। কম আত্মবিশ্বাসী মানুষ সবসময় নিজের নেয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুশোচনা করে, কাজের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। ফলে সে পেছনে পড়ে যায় এবং সাফল্য অর্জনের লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় মানুষের সামনে কম আত্মবিশ্বাসী লোকেরা বক্তব্য দিতে ভয় পান। নিজের মতামত প্রকাশ করতে চান না। তারা সবসময় চিন্তা করতে থাকেন যে, যদি অন্যেরা আমার সঙ্গে একমত না হয়, আমার বিরোধিতা করে, তাহলে কী হবে? যথাযথ আত্মবিশ্বাসী মানুষ যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো জায়গায় মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে গুছিয়ে নিঃসংকোচে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে। কম আত্মবিশ্বাসী মানুষ মাঝে মধ্যেই মাথা নিচু করে চলাফেরা করে। অপর দিকে আত্মবিশ্বাসী মানুষ তার আচার ব্যবহারের মাধ্যমেই নিজের আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে দেন। সব সময় তাদের মাথা উঁচু থাকে এবং তাদের দেখলেই বোঝা যায় যে, তারা অনেক আত্মবিশ্বাসী। কম আত্মবিশ্বাসী মানুষ সবসময় নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়। বাধা এলে কিংবা অসম্ভব মনে করলে তারা সরে দাঁড়ায়। আত্মবিশ্বাসী মানুষ যত বাধাই আসুক না কেন, যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন– তারা সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়।

আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্য সর্বপ্রথমে নিজের নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিকগুলো জেনে নিন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কতটুকু আত্মবিশ্বাসী। এই আত্মবিশ্বাসের কারণ কী? খারাপ দিকটি কী ও কেন? সততার সাথে নিজের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। তাহলে আপনি খুঁজে পাবেন আপনার আত্মবিশ্বাসী হওয়ার পথে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো। এবার নেতিবাচক দিকগুলো সংশোধনের চেষ্টা করুন। আর ইতিবাচক দিকগুলো আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করুন। আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন। নিজেকে মন থেকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার গুরুত্বটা বোঝানোর চেষ্টা করুন। আত্মবিশ্বাসী হতেই হবে- এ প্রতিজ্ঞা করুন। অন্যকে লক্ষ্য করুন। আত্মকেন্দ্রিকতা ভুলে অন্যের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করা আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠার অন্যতম উপায়। জীবনটাকে একটা পরিবর্তনের সুযোগ করে দিন। সুযোগটা কাজে লাগান। একটা নতুন কিছু করুন। হতে পারে সেটি কোনো ছোট্ট একটি কাজ। হতে পারে ভালো কোনো একটা বই পড়া। যা কিছু ভালো এ ধরনের কিছু একটা করুন। এতে আপনার মনের ওপর চাপ কমবে। মনের ওপর বাড়তি চাপ রেখে আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায় না। অজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করুন। যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সেই মহান রবের নিকট সাহায্য

www.nagorikpathagar.org

প্রার্থনা করুন। জীবনের সকল পঙ্কিলতা দূর করার পাশাপাশি বিগত দিনের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নতুন করে আর ভুল না করার প্রতিজ্ঞা করুন দেখবেন আপনি আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবেন।

আমাদের সবার সবসময় মনে রাখা উচিত, কাজ করলে ছোটখাটো ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে এবং সেই ভুল-ভ্রান্তি থেকেই পরবর্তীতে শিক্ষা নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলাটাই মূল লক্ষ্য। জীবনের প্রতি আগ্রহমূলক একটা ইতিবাচক মনোভাব রাখাই হলো নিজের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার প্রথম ধাপ। প্রতিদিন আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তার বেশির ভাগই আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না। এ কারণে সেসব পরিস্থিতি নিয়ে অযথা চিন্তা করারও কোনো মানে হয় না। তবে যে পরিস্থিতি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, সেক্ষেত্রে যতটা সম্ভব নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতি বিচার করার চেষ্টা করুন। অনেক সময়ই হতে পারে, যেকোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনি যে সিদ্ধান্ত নিলেন পরে গিয়ে দেখলেন, সেই সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোপুরি সঠিক ছিল না। সে ক্ষেত্রেও কখনোই নিজের আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। প্রত্যেক মানুষ নিজের ভুল থেকেই শেখে। আর এই ভুল থেকে শিক্ষা নেয়া হলো মূল উদ্দেশ্য। মনে রাখবেন, একবার ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেই যে জীবনে আপনি কখনো কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না অথবা সব সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যই আপনাকে অন্য কারো সাহায্য নিতে হবে এমন ধারণাও একেবারেই ভুল। কয়েকটি ছোটখাটো জিনিসের দিকে খেয়াল রাখলেই দেখবেন আপনার নিজেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে।

কাজ করার সময় টেনশন, হতাশা, বাধা-বিপত্তি এসব কিছু যেন আত্মবিশ্বাসকে ধাক্কা না দেয়। মনে রাখতে হবে এসব নেতিবাচক ভাবনাকে আমলে নিলেই জীবনের পথে অনেকটা পিছিয়ে পড়তে হবে। হারাতে হবে আত্মবিশ্বাস। মনে রাখতে হবে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। আর এই আত্মবিশ্বাস নিজের মাঝে তৈরি করার জন্য সবার আগে নিজেকে বদলাতে হবে। নিজেকে বদলাতে পারলেই বদলে যাবে আপনার চারপাশ, সাফল্য আসবে হাতের মুঠোয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না সে জাতি নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়" (সূরা আর রা'দ : ১১)।

www.nagorikpathagar.org

পরিকল্পনা

১. যদি লক্ষ্য থাকে অটুট

সাফল্যের অভীষ্টে ছুটে চলা মানুষের সঙ্গী একটি চমৎকার স্বপ্ন। যে চমৎকার স্বপ্নটিকে ধারণ করেই মানুষ সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছতে চায়। তবে শুধুমাত্র একটি সুন্দর স্বপ্নকে লালন করেই সাফল্যের কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছা যায় না। যে বিষয়ে স্বপ্নের জাল বোনা হয় সে বিষয়ে একটি লক্ষ্য ঠিক করে নিয়ে তবেই সামনে এগোতে হয়। লক্ষ্যহীন ছুটে চলায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হয় না। লক্ষ্য যদি ঠিক না হয়, সুনির্দিষ্ট করা না হয় তাহলে এ ছুটে চলা হবে কূলহারা তরীর মত। কূলহারা তরী যেমন নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ছাড়াই ভাসতে থাকে, সময় যায় দিন যায় কিন্তু তীরের সন্ধান পায় না, নির্দিষ্ট কোনো সীমানায় ভিড়তে পারে না। তেমনি লক্ষ্যহীন ব্যক্তিও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় গন্তব্যহীন কূলহারা তরীর মত লক্ষ্যহীন গন্তব্যে ছুটতে থাকেন। ফলে তিনি শুধু পথ চলতেই থাকেন। দিন ফুরিয়ে যায়, সময় ফুরিয়ে যায় তবু তার গন্তব্য শেষ হয় না।

যাদের কোনো লক্ষ্য নেই তারা কখনো অভীষ্টে পৌঁছতে পারেন না। যারা সাফল্য চান, সফল হতে চান তারা দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখেন লক্ষ্যের দিকে। জীবনে সফলতার পথে অগ্রসর হতে তারা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে সে দিকে মনোসংযোগ করেন। সাফল্য লাভের জন্য লক্ষ্যকে এমন উঁচুতে তারা নিবদ্ধ করেন যাতে সাফল্য লাভের ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়। সেই সম্ভাবনা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে গতি সঞ্চার করে। ব্যাপক উদ্দীপনা তৈরি করে দেহ ও মনে। পরিশ্রমকে সার্থক করে তোলে।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের জীবন চলার পথ কখনো কিন্তু সহজ সরল হয় না। চলার পথে অনেক বাঁক থাকে। প্রতিটি বাঁকে মানুষকে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। আর এটাই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনের এই পথচলায় প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা, ঝড়ঝঞ্ঝা মাড়িয়ে মানুষকে মঞ্জিলে পৌঁছাতে হয়। চলার শুরুতেই যদি প্রত্যেক ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে এগোতে পারেন তাহলে শত প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা, ঝড়ঝঞ্ঝা মাড়িয়ে তিনি সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে পারেন। 'যদি লক্ষ্য থাকে অটুট' তবে সাফল্য সুনিশ্চিত।

একটি সুন্দর স্বপ্নের বাস্তব রূপ তথা সাফল্য লাভের জন্য একটি কর্মপ্রচেষ্টাসমৃদ্ধ লক্ষ্য থাকা দরকার। কারণ অনেক সময় দক্ষতা থাকলেও লক্ষ্য স্থির না থাকায় কাজে সাফল্য আসে না। মুক্ত বিশ্বকোষ **Wikipedia**-তে বলা হয়েছে, **A goal is an idea of the future or desired result that a person or a group of people envisions, plans and commits to achieve.** অর্থাৎ- লক্ষ্য (**Goal**) হল ভবিষ্যত বা প্রত্যাশিত ফলাফল লাভের এমন একটি ধারনা যা একজন ব্যাক্তি বা মানুষের একটি গ্রুপের স্বপ্ন, পরিকল্পনা এবং অর্জনের প্রতিশ্রুতি। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকলে পথের নিশানা যেমন পাওয়া যায় না তেমনি কাজেও পাওয়া যায় না সফলতা। আর নিশানা যখন সহজ হয় তখন লক্ষ্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও থাকে উজ্জ্বল। এ জন্য সাফল্যের ছোঁয়া পেতে লক্ষ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। যারা লক্ষ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হবেন তারা সাফল্য অর্জনেও হবেন ব্যর্থ।

লক্ষ্যের গুরুত্ব যখন এত বেশি তখন আমাদের সমাজে দেখা যায় কিছু মানুষ লক্ষ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন না। এর পেছনে কারণও রয়েছে। কেউ লক্ষ্যের গুরুত্ব বুঝেন না, কিংবা কারো এ সংক্রান্ত শিক্ষা নেই। আবার কেউ জানার পরও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন কি না এই সন্দেহে লক্ষ্য নির্ধারণ করেন না। কারো আত্মবিশ্বাসের অভাব কিংবা কারো সমস্যা সীমাবদ্ধ-চিন্তা। কিন্তু সকলকেই স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে লক্ষ্য হচ্ছে ধাপে ধাপে উন্নীত হওয়ার নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতির নাম। আর লক্ষ্য স্থির করা মানে হচ্ছে একের পর এক অর্জিত হওয়া কয়েকটি পদ্ধতির সমি" এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে সাফল্য লাভের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। তবে এ লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রতিদিন কিছু না কিছু কাজ করে প্রাথমিকভাবে প্রতিনিয়ত অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে। তাই প্রতিদিনের জন্যও আলাদা করে কিছু লক্ষ্য স্থির করতে হবে যা অর্জনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকেই দ্রুত এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। যেমন একজন ছাত্র কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫ অর্জনের লক্ষ্য স্থির করলো। এখানে

www.nagorikpathagar.org

জিপিএ ৫ পাওয়াটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে অর্থাৎ জিপিএ ৫ পেতে তাকে কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করে সামনে এগোতে হবে। প্রতিদিন কত ঘণ্টা পড়ালেখা করলে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে এটি তাকে ঠিক করতে হবে। পাশাপাশি তাকে সিলেবাস প্রণয়ন, অগ্রাধিকার পাঠও নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিদিন কতটুকু অভীষ্টে এগোনো সম্ভব হলো তার হিসেবও করতে হবে। আগামীকাল কতটুকু লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে তাও ঠিক করতে হবে।

লক্ষ্যের সাথে নিয়তের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। কারণ যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের ওপরেই নির্ভর করে। নিয়তের আরেকটি পরিপূরক নামই হলো লক্ষ্য স্থির। কেউ যদি বলে আমি অমুক কাজ করার নিয়ত করলাম। তার মানে তিনি কোনো একটি কাজ করার লক্ষ্য স্থির করলেন। মানুষ কী জন্য সাফল্য অর্জন করতে চায় তার উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। কারণ কাজের বিশুদ্ধতা নিয়তের শুদ্ধতার ওপর নির্ভর করে। তাই লক্ষ্য স্থির করতে নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন। মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলে কারীম (সা) কাজের শুরুতে নিয়তের তথা লক্ষ্য স্থির করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন- যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের ওপরেই নির্ভর করে। প্রতিটি লোক তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। (বোখারি ও মুসলিম)

লক্ষ্য স্থির জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা সফলতার ছোঁয়া পেতে চান তাদের জন্য কাজের শুরুতে লক্ষ্য নির্ধারণ করা অবশ্যক। কারণ লক্ষ্য নির্ধারণ না করে যদি কাজ শুরু করে দেয়া হয় তাহলে তাতে সাফল্য জোটার সম্ভাবনা থাকে খুবই ক্ষীণ। একজন নৌকার মাঝি সারাদিন নৌকা বাইতে থাকলেন কিন্তু তিনি লক্ষ্য স্থির করলেন না কোন ঘাটে ভিড়বেন তাহলে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। তার সারাদিনের নৌকায় বৈঠা চালানো পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

অনেকেই বড় সাফল্য অর্জনের জন্য লক্ষ্য স্থির করতে সাহস করেন না। ছোট ছোট সাফল্যের পেছনেই ছোটাছুটি করেন। কিন্তু লক্ষ্য যদি স্থির করা যায় তাহলে যেকোনো বড় সাফল্যও ধরা দিতে পারে। রাসূল (সা) যখন পারস্যকে মুসলমানদের পদানত করার লক্ষ্য স্থির করেছিলেন তখন পারস্য সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বব্যাপী এক অপরাজেয় শক্তি, আর মুসলমানদের হিসাব করার মতো কোনো শক্তিই ছিল না। তারপরও রাসূল (সা) লক্ষ্য স্থির করেছিলেন পারস্যকে মুসলমানদের পদানত করার। লক্ষ্য স্থির করে দীপ্ত সাহস ও পরিশ্রমের ফলে একদিন সত্যিই পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের পদানত হয়েছিল। বিশ্ববিজয়ী বীর

www.nagorikpathagar.org

জুলিয়াস সিজার বলেছিলেন, "অধিকাংশ মানুষ বড় হতে পারে না কারণ সে সাহস করে আকাশের মতো সূর্যে লক্ষ্য স্থির করে সেদিকে তাকাতে পারে না বলে" লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যদি না থাকে তাহলে অর্জন শূন্য হতে বাধ্য। সাফল্যের পেছনে ছুটতে হলে আপনাকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। কেননা আপনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যই আপনাকে সাফল্যের পথে চলতে সাহয্য করবে।

তবে লক্ষ্যের মাত্রা এবং উচ্চতার মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত। ব্যক্তি তার লক্ষ্যকে এমন উচ্চতায় নিবদ্ধ করা উচিত যাতে লক্ষ্য অর্জনে নিজের ভেতর থেকেই স্পৃহা জাগ্রত হয়। অনেকে লক্ষ্য স্থির করতে গিয়েই খেই হারিয়ে ফেলেন। লক্ষ্য স্থির করার আগেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারা না পারার দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য লক্ষ্যের মানদণ্ড যাচাই করে নেয়া উচিত। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে, সাফল্য লাভের জন্য জীবনের সব লক্ষ্য পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া উচিত। নিজের সুন্দর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে লক্ষ্য স্থির রেখে সুনির্দিষ্ট কর্মতৎপরতার মাধ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। অর্থহীন লক্ষ্য এবং জাতীয় জীবনের সাথে মূল্যবোধহীন লক্ষ্য স্থির ব্যক্তির সফলতার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। যত তাড়াতাড়ি জীবনের লক্ষ্য স্থির করা যায় সফলতা অর্জন ততই সহজ হয়। কারণ জীবনের লক্ষ্য স্থির থাকলে তাতে সাফল্য অর্জনের আবেগও থাকবে। আর লক্ষ্য স্থির যখন করবেন তখন দেখবেন আপনার লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে আবেগ ও উচ্ছ্বাস যুক্ত হয়েছে। এর সাথে শুধু অধ্যবসায় যোগ করে দিতে পারলেই সফলতা অর্জন সম্ভব।

খুব পরিচিত একটি গানের সুরের সাথে মিলিয়ে বলতে হয়, "যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, বিশ্বাস হৃদয়ে, হবেই হবেই দেখা, দেখা হবে বিজয়ে" হ্যাঁ, সত্যিই লক্ষ্য স্থির করে যদি আপনি ছুটতে পারেন, তাহলে বিজয় তথা সাফল্যের দেখা আপনি অবশ্যই পাবেন।

২. প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার

সাফল্যের স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন যথার্থ ও সুন্দর পরিকল্পনা। পরিকল্পনাবিহীন কাজ মানেই উদ্দেশ্যবিহীন পথচলা। পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যক্তি ধাপে ধাপে তার লক্ষ্যে পৌঁছার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবতাকে সামনে রেখে র্নিদিষ্ট সময়ের মাঝে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অগ্রিম কাজের তালিকা প্রণয়ন করাই হল পরিকল্পনা গ্রহণ। পরিকল্পনার আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে বিভিন্ন কার্যাবলি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করা এবং তথ্য সংগ্রহ

www.nagorikpathagar.org

করা। পরিকল্পনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে আগামীর পথ নির্দেশ করে। তাই পরিকল্পনাকে কাজের সূচনা বা কাজের প্রবেশদ্বার বলা হয়ে থাকে।

সফলতা অর্জনের জন্য, কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য শুরুতেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। পরিকল্পনা যথার্থ হলে তার রেজাল্টও ভাল হবে। আবার পরিকল্পনা সঠিকভাবে নিতে না পারলে কাজের ফলাফল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বলা হয়ে থাকে- **If we fail with right scheme, we will take the wrong succeed.** অর্থাৎ যদি আমরা পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা ব্যর্থ হওয়ার পরিকল্পনাই গ্রহণ করলাম। এমন ধরনের পরিকল্পনা আমাদের করা উচিত নয় যে পরিকল্পনা আমাদের ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যাবে। পরিকল্পনা গ্রহণে প্রয়োজন উন্নতমানের বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া, বিবেচনাপ্রসূত কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং উদ্দেশ্য, ঘটনা ও হিসেবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পরিকল্পনা কাজের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়, মিতব্যয়িতা অর্জনে সহায়তা করে, পরিবর্তিত অবস্থার মুকাবিলা করার পন্থা বাতলে দেয়, কাজের মান নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করে। এ ছাড়াও ব্যক্তির পাশাপাশি পরিকল্পনা সংগঠনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, নানাবিধ সমস্যার সমাধান, সীমিত জনশক্তির সঠিক ব্যবহার এবং সার্বিক কাজের সমন্বয়ে সাহায্য করে।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজেই সফলতা আসে না। কী ব্যক্তিজীবনে, কী সমাজে, কী ব্যবসায়ে, কী রাষ্ট্রীয় কাজে সর্বক্ষেত্রেই পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন বছরটা কিভাবে পরিচালিত হবে তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ। পরিকল্পনা হবে দলগত এবং ব্যক্তিগত। পরিকল্পনা হবে আউটপুট-ভিত্তিক। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা বছরের শুরুতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না। কেউ দলগত তথা সম্মিলিত পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও ব্যক্তিগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না। বছরের মাঝামাঝি কিংবা বছরান্তে যে পর্যালোচনা করা হয় সেখানে কিন্তু দলগত পর্যালোচনার পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যালোচনাও হয়ে থাকে। তাই শুরুতেই দলগত এবং ব্যক্তিগত দুই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণই জরুরি। কখনো কখনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ধারণাভিত্তিক কিংবা আন্দাজের ওপর। এ ধরনের পরিকল্পনা কখনো সুফল বয়ে আনে না। বহুল প্রচলিত একটি মূল্যবান বাক্য আছে- **Well plan is half done.** অর্থাৎ পরিকল্পনা কাজের অর্ধেক। এটি শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কর্মীদের শ্রেণিবিন্যাস, মান, কাজের পরিধি ও পরিসংখ্যানমূলক তথ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সার্বিক বাধা প্রতিবন্ধকতা পর্যালোচনার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্য নির্ধারণের পর সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের। যেমন- যদি ধরা হয় একজন লোক ঢাকায় পৌছানোর টার্গেট বা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এখানে ঢাকায় পৌছানো হল তার লক্ষ্য এই লক্ষ্যে পৌছাতে তাকে কিছু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। যেমন- ঢাকায় যাওয়ার মাধ্যম কি হবে, বিমান, রেল না সড়ক পথ, ২য় হচ্ছে কত অর্থের প্রয়োজন হবে, ৩য় হল কত সময় লাগবে এই মৌলিক বিষয়গুলোতে যদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না নিয়ে ঢাকার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেন তাহলে দেখা যাবে পরিকল্পনা না থাকায় বাহন ঠিক হয়নি, অর্থ না থাকায় বাহনে আরোহণ করা যায়নি ফলে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যেই পৌছা সম্ভব হয়নি। মহান আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। তিনি সুপরিকল্পিতভাবে বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন এবং পরিকল্পনা মাফিক ধ্বংস করবেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানবজাতি পরিকল্পনা বিষয়ক ধারণা মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকেই পেয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, এভাবে যে রাত্রি দিনকে দ্রুত ধরে ফেলে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র নিজ আদেশের অনুগামী। জেনে রেখো, সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা তাঁরই কাজ। বড় বরকতময় আল্লাহ, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক" (সূরা আরাফ : ৫৪)। তিনি সৌরজগৎকে যথাস্থানে স্থাপন করেছেন, দুনিয়ার ভারসাম্য রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে নদী-নালা, সাগর, পাহাড়-পর্বত ও বনভূমি স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাআলাই রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে পয়দা করেছেন, (এদের) প্রত্যেকেই (মহাকালের) কক্ষপথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। এসব কিছুই সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফসল। পরিকল্পনা মাফিক আসমান ও জমিনের নীলনকশা তৈরি করে এগুলোকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজেই বুঝা যায় যে, প্রতিটি বস্তুই পরিকল্পনা মোতাবেক তৈরি, যার ফলে প্রকৃতির কোথাও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অবকাশ নেই।

পরিকল্পনা গ্রহণের পর নির্দিষ্ট সময়ান্তে এর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন হওয়া জরুরী। অনেকেই আছেন কাজ করতেই থাকেন কিন্তু কাজের কোয়ালিটি কেমন, সময়ের আলোকে কাজ কতটুকু বাস্তবায়িত হল তা মূল্যায়নই করেন না। ফলে কখনো কখনো দেখা যায় পরিকল্পনার বিশাল একটি অংশ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ অংশটিই বাদ পড়ে যায়। মাঝে মাঝে পরিকল্পনা পর্যালোচনা না হওয়ায় দেখা যায় মানহীন কাজ পুরো বছর ধরে চলতে থাকে। কাজ শেষে আফসোস করার চাইতে সময়ে সময়ে তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে পারলে কাজের এবং পরিকল্পনার শতভাগ সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

৩. হতাশা ঝেড়ে ফেলুন সম্ভাবনাকে সম্পদ মনে করুন

সফলতার চূড়ায় উঠতে গেলে মাঝে মধ্যে হোঁচট খেতে পারেন, ব্যর্থতার পাল্লায় পড়তে পারেন। কিন্তু তাই বলে কাজের শুরুতেই পরিকল্পনার সময়েই ব্যর্থতার আশঙ্কা করা মোটেই কাম্য নয়। কারণ ব্যর্থতার আশঙ্কা সফলতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। যারা এ ধরনের মানসিকতা পোষণ করেন তারা শুরুতেই হেরে বসেন। শিশুরা যখন হাঁটতে চেষ্টা করে তখন মাঝে মধ্যেই পড়ে যায়, কখনো পড়ে গিয়ে আহতও হয়। কিন্তু সেই পড়ে যাওয়ার অর্থ হোঁচট খাওয়া নয়। সেই পড়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, তারা হাঁটতে শিখবে না কিন্তু যদি শিশু এবং তার পিতা-মাতা এ ব্যাপারে হতাশ হয়ে হাঁটার প্রচেষ্টাই বন্ধ করে দেন তাহলে তারা কোন দিনই হাঁটতে পারতো না। সফলতার পানে ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেলে আবার দাঁড়াতে হবে আবার ছুটতে হবে লক্ষ্য পানে। একদিন ঠিকই এমনি করে পৌঁছা যাবে সাফল্যের শিখরে। কোন একটি বিষয়ে ব্যর্থ হলে আমাদের মাঝে কিছু ব্যক্তি নিজেকে সব বিষয়েই ব্যর্থ মনে করে হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু সত্যিকারার্থে তারা এটা বুঝতে ব্যর্থ হন যে কোন একটি বিষয়ের ব্যর্থতাই পূর্ণ ব্যর্থতা নয়। একটি বিষয়ের ব্যর্থতা অন্য বিষয়ের সফলতার পাথেয় হতে পারে যদি হতাশ না হয়ে ভুলগুলো শুধরে নেয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

নিজের মধ্যে কখনো যদি কোন দুর্বলতা দেখা দেয় তা বলে বেড়ানোতে বা অন্যের নিকট প্রকাশ করাতে কোনো কল্যাণ নেই। অবস্থা শোচনীয়– এ কথা কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। তাতে কোনো লাভও হবে না। বরং হতাশা ঝেড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে চল্লেন দেখবেন শোচনীয় অবস্থা কেটে সাফল্যের দুয়ার খুলে গেছে। কেউ হয়তো আপনাকে ছোট বলবে, দুর্বল ভাববে, আপনাকে দেখলে ব্যর্থতার হিসাব কষবে। তাতে কি যায় আসে বরং আপনি এগুলোকে একেবারেই নিজের মধ্যে না নিয়ে দূরে ঠেলে রেখে কাজ করুন, দেখবেন আপনি সফল হবেন। কেউ আপনাকে তুচ্ছজ্ঞান করুক– আপনি যদি কাজে মগ্ন থেকে এটিকে নিয়ে চিন্তাও না করেন তাহলে দেখবেন আপনিই সফল। হতাশাকে যে লালন করে, অনবরত হা-হুতাশ হায় হায় করে সে মূলত তার দুঃখ কষ্টকেই বর্ধিত করে, ব্যক্তিজীবনে যতই দুঃখ কষ্ট থাকুক না কেন তা যদি আনন্দের সাথে বরণ করে নেয়া যায় তাতেই মূল সার্থকতা।

স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস তার দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে শক্তিশালী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পাঁচবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিবারই পরাজিত হন। অতঃপর লজ্জায়, অপমানে এক গুহায় আত্মগোপনে চলে যান। সেখানে তিনি দেখতে

www.nagorikpathagar.org

পান একটি মাকড়সা জাল বুনতে গিয়ে পাঁচবার ব্যর্থ হয়ে ষষ্ঠবারে সফল হয়। তিনি চিন্তা করলেন খুদে মাকড়সা যদি সফল হতে পারে তাহলে তিনি কেন পারবেন না। ফিরে এলেন গুহা থেকে, আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেন তিনি। ৫২ বছর বয়সে আবরাহাম লিংকন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি পূর্বে কতবার ব্যর্থ হয়েছেন তার হিসাব কেউ করে না। ২১ বছর বয়সে আবরাহাম ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হন। ২২ বছর বয়সে আইনসভার নির্বাচনে পরাস্ত হন। পুনরায় ব্যবসায় যোগ দিয়ে ২৪ বছর বয়সে আবারো ক্ষতিগ্রস্ত হন। ২৬ বছর বয়সে প্রিয়তমা স্ত্রী মারা যান। ৩৪ বছর বয়সে কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশ নিয়ে পরাস্ত হন। ৪৫ বছর বয়সে সাধারণ নির্বাচনে তার ভরাডুবি হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন ৪৭ বছর বয়সে। সিনেটর নির্বাচনে আবার হারলেন ৪৯ বছর বয়সে। তার ৫০ বছর পর্যন্ত শুধু ব্যর্থতা আর পরাজয়ের মধ্য দিয়েই কাটে। তিনি তবুও হতাশ হননি। ৫২ বছর বয়সে ঠিকই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

অনেকেই আছেন চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখতে পান। আলোর রেখা মনে হয় যেন তাদের থেকে যোজন যোজন দূরেই অবস্থান করে। বাতির চারপাশের অন্ধকারকে তারা গোটা জগতেরই অন্ধকার মনে করে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত অন্ধকারের বিপরীতে আলোও আছে। সূর্যের হিসেবেইতো দেখা যায় পৃথিবীর এক প্রান্ত যখন অন্ধকারে অপর প্রান্ত তখন আলোয় উদ্ভাসিত। এটাইতো বিধির নিয়ম। রাত না এলে কখনো কি প্রভাত আসতো? রাত যত গভীর হয় প্রভাত ততই কাছে আসে। রাত গভীর থেকে গভীরতম হওয়া মানে সব শেষ নয়। অন্ধকার নিকষ কালো হওয়া মানেই আঁধারের অতল গহবরে তলিয়ে যাওয়া নয়। বরং রাত পোহালেই ভোর হবে, আলোয় আলোয় ভরে উঠবে জগৎ। আঁধার কেটে গিয়ে দীপ্তিময় সূর্য জ্বলজ্বল করবে- সেই মুহূর্ত বা সেই সময়টুকুর কথা ভেবেই পদক্ষেপ নেয়া উচিত নয় কি? একটি অন্ধকার রজনীই কারো জীবনের শেষ রজনী নয় বরং একটিমাত্র প্রভাতই কারো কারো জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সাফল্যবঞ্চিত, হতাশাগ্রস্ত কিংবা গভীর রাতে বিপদগ্রস্ত একজন ব্যক্তির জন্য একটি সকাল বা একটি সুবহে সাদিকই বিশাল সম্ভাবনার দ্বার। কিন্তু অনেকেই আছেন যারা সেই সম্ভাবনাকে হিসেবের মধ্যেই আনতে চান না। হাজারো আঁধার রাতের বিপরীতে একটি সকালই পাল্টে দিতে পারে পরিস্থিতি। পাল্টে দিতে পারে জীবনের গতিধারাকে। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে সম্ভাবনাময়ী একটি সকালের প্রতীক্ষাই ব্যক্তির জীবন পাল্টে দিতে যথেষ্ট, যদি সেটিকে সম্পদ বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ কাগজে-কলমে কত হিসাবই না করে, কত পরিকল্পনা করে। কিছু কিছু হিসাব কাগজে-কলমে থেকে যায়। কখনো কখনো আলোর মুখই দেখে না। সব হিসাবই যদি সঠিক হতো তাহলে দুনিয়াতে এত উত্থান-পতন হতো না। যত হিসাব-নিকাশ বা পরিকল্পনাই করা হোক না কেন সাফল্য-ব্যর্থতা, জয়-পরাজয় সব কিছু নির্ধারণের মালিক যিনি, তিনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তিনিই পারেন মাত্র একভাগ সম্ভাবনাকে শতভাগে রূপান্তরিত করতে, নিরানব্বই ভাগ হতাশাকে দূরীভূত করে শতভাগ সাফল্য নিশ্চিত করে দিতে। আবার শতভাগ সম্ভাবনাকে তিনি মুহূর্তেই গুঁড়িয়ে দিতে পারেন। পৃথিবীতে এরকম বহু উদাহরণ আছে যারা একভাগ সম্ভাবনাকে সম্পদ মনে করে কাজ করেছেন আল্লাহ্ তাদের প্রচেষ্টাকে শতভাগ সাফল্যে রূপান্তরিত করেছেন। সকাল বেলায় যিনি বাদশাহ তিনি সন্ধ্যা বেলায় ফকির হয়েছেন। আর সকাল বেলার ফকির সন্ধ্যায় বাদশায় পরিণত হয়েছেন। ফকিরের বাদশাহির সম্ভাবনা না থাকলেও তিনি সন্ধ্যায় বাদশাহি পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন, "বলুন, হে আল্লাহ্! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন কর আর তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর" (সূরা আলে ইমরান : ২৬-২৭)।

হতাশার বিপরীত হলো সম্ভাবনা। সম্ভাবনা মানুষের জীবনের এক বিশাল সম্পদ। যারা সম্ভাবনাকে সম্পদ মনে করে পরিকল্পিতভাবে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন পৃথিবীতে তারাই সাফল্যের বিজয়মুকুট অর্জন করেছেন। অনেকেই আছেন সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে চান না। হোক সেটা ছোট কিংবা বড় ধরনের সম্ভাবনা, হোক সেটা এক ভাগ কিংবা শতভাগ। আবার কেউ আছেন ছোটখাটো সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেন, শুধুমাত্র তারা নিরানব্বই ভাগ সম্ভাবনাকেই গুরুত্ব দিতে চান, বাকি ছোটখাটো সম্ভাবনাকে তারা এক প্রকার ছুড়েই ফেলে দেন। এ ধরনের লোকজন সাধারণত সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হন। মনে রাখতে হবে অনেক সময় ছোটখাটো সম্ভাবনাই অনেক বড় সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত করে, অনেক বড় অর্জনের ভিত্তি রচনা করে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় শুধু রাসূল (সা) ছাড়া আর কেউ হুদাইবিয়ার সন্ধিকে সাফল্যের ন্যূনতম সম্ভাবনা হিসেবেও বিবেচনা করেননি। ১৪০০ জন সাহাবী নিয়ে হজ করতে গিয়ে শুধুমাত্র সন্ধি করে ফিরে আসাকেই সবাই বিরাট পরাজয় বলে ধরে নিলেও রাসূলে

www.nagorikpathagar.org

আকরাম (সা) সেটিকে ভবিষ্যতের বিজয়ের অপার সম্ভাবনাই মনে করেছিলেন। এবং বাস্তবেও তার প্রতিফলন দেখা গেছে। ঐতিহাসিকগণ হুদাইবিয়ার সন্ধিকে মক্কা বিজয়ের ভিত্তি বা সূচনা বলে অভিহিত করেছেন। এটি যে সুস্পষ্ট বিজয় মুসলমানদের জন্য তা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় আমি আপনাকে এক প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি" (সূরা আল-ফাত্হ : ১)।

ভোরে একটি পাখি যখন তার নীড় থেকে খাদ্যের সন্ধানে বের হয় তখন কতটুকু সম্ভাবনা নিয়ে বের হয়? নিশ্চয় খাদ্য পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা তার থাকে না। কিন্তু তারপরও অনিশ্চয়তা নিয়ে বের হওয়া পাখিটি সন্ধ্যায় ঠিকই ভরপেটে নীড়ে ফিরে! ০% সম্ভাবনাকে ১০০% তথা ভরপেটে উন্নীত করতে যিনি ব্যবস্থা করলেন সেই মহান আল্লাহতো সব কিছুই পারেন। মানুষও যদি মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করতো তাহলে তিনিও মানুষের হতাশাকে সম্ভাবনায় পরিণত করতেন, তিনিও পাখির মতো মানুষের রিজিকের ব্যবস্থা করতেন। এ প্রসঙ্গে হজরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূল (সা) বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করার হক আদায় (পূর্ণ ভরসা) করতে তবে তিনি পাখিকে রিজিক দেয়ার মতোই তোমাদেরকেও রিজিক দিতেন। পাখিতো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে" (তিরমিজি)।

সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনের জন্য যারা কাজ করেন কিংবা ব্যক্তির সার্বিক জীবনের পুনর্বিন্যাস সাধনের লক্ষ্যে যারা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তারা কতটুকু সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করেন? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কখনো যার ব্যাপারে শতভাগ সম্ভাবনা নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছিল তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছেন আর যার ব্যাপারে কোনো সম্ভাবনাই ছিল না তিনি জীবনটাকেই পাল্টে দিয়েছেন। সমাজে এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী আমি আপনি। কেউ এমন ঘটনা বাস্তবে দেখেছেন কেউবা শুনেছেন। তাই সম্ভাবনাকে অবহেলা করতে নেই হোক সেটা সিকি ভাগ কিংবা শতভাগ। বরং সম্ভাবনাকে সম্পদ মনে করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন দেখবেন সাফল্য আসবেই। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তোমরা হতাশ হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হয়ে থাকো" (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)।

www.nagorikpathagar.org

৪. নেতিবাচক নয় ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন

সাফল্য অর্জনের জন্য ইতিবাচক চিন্তা যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং তা লালন করা যে অত্যাবশ্যক সে সম্বন্ধে **Napoleon Hill-Gi Think and Grow Rich** বইয়ের মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যার ইংরেজি প্রকাশকাল ১৯৩৭ সালে। পরবর্তী সময়ে নেপোলিয়ান হিল এবং ডব্লিউ কেমেন্ট স্টোন আরও একটি বই রচনা করেন যাতে সরাসরি ইতিবাচক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাফল্য অর্জনের জন্য মুখ্য উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি একজন ব্যক্তিকে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় করে তোলে। ইতিবাচক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা এমন নির্দেশ বোঝায় যার মাধ্যমে আস্থা, সততা, আশা, সাহস, প্রত্যাশা, সৌজন্যতা, ধৈর্য, কৌশল, দয়ার মতো ভালো সাধারণ কিছু অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। একজন সাধারণ মানুষের জীবনেও সমস্যা থাকে, বাধা, দুঃখ, হতাশা, সম্পদের অভাব থাকে কিন্তু তারপরও ইতিবাচক চিন্তা এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ইতিবাচক কাজ করে জীবন সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। জীবনে সমস্যা থাকবেই কিন্তু সমস্যার কারণে নেতিবাচক চিন্তা করে, ভয়ে ভীত না হয়ে, বসে না থেকে ইতিবাচক দিকগুলোকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে এনে সামনে এগিয়ে যেতে হবে ইতিবাচক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

মানুষের স্বভাবগত অভ্যাস হলো নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। সমাজে প্রায়ই লক্ষ করা যায় ইতিবাচক দিকগুলোকেও অনেক সময় নেতিবাচক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়। বিষয় যতই জটিল হোক না কেন প্রত্যেক বিষয়েরই ইতিবাচক দিক থাকে, সেটিকে ফুটিয়ে তুলে নেতিবাচক না বলাই শ্রেয়। কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে নিজেকে ইতিবাচক ভূমিকায় উপস্থাপন করা আবশ্যক। সাক্ষাৎ করা ব্যক্তিটির জীবনে নিজের সুন্দর পরিচয়কে তুলে ধরে যার সাথে সাক্ষাৎ হবে তার জীবনে আমি ইতিবাচক ভূমিকায় হাজির হবো– এটাই আমার সাক্ষাতের মূল সার্থকতা। যার সাথে সাক্ষাৎ হবে তার সামনে নিজেকে ইতিবাচক ভূমিকায় উপস্থাপন কার্যকর সহায়ক শক্তি হিসেবে ফল দিতে পারে। অনেক সময় ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটোই সমান পর্যায়ের হয় তখন ইতিবাচক চর্চা নেতিবাচক বিষয়কে চাপা দিয়ে নেতিবাচকের বিরুদ্ধে বিজয়টা ছিনিয়ে আনা সম্ভব। চিন্তা এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক চিন্তা কল্যাণ বয়ে আনে। কোনো একটি কাজ করতে গিয়ে কাজের নেতিবাচক দিকগুলোকে প্রাধান্য না দিয়ে ইতিবাচক দিকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সেগুলোকেই সম্ভাবনা ধরে পরিকল্পিতভাবে সামনে এগোতে পারলে সাফল্য নিশ্চিতভাবেই ধরা দিবে। আর যদি নেতিবাচক চিন্তাই শুধু মনের ভেতর ঘুরপাক খায় তাহলে কাজে সফলতা

www.nagorikpathagar.org

তো দূরের কথা কাজ শুরু করাই কঠিন হবে। প্রতিটি কাজে কিংবা কাজের শুরুতে ইতিবাচক চিন্তা কাজের ক্ষেত্রে বিরাট আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। ইতিবাচক চিন্তা কাজের অর্ধেক আর বাকিটুকু পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে। ইতিবাচক চিন্তা একটি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরির নিয়ামক শক্তি। ইতিবাচক চিন্তা ছাড়া যেমন কল্যাণ নিশ্চিত হয় না তেমনি নেতিবাচক চিন্তাকে দূরে ঠেলে দেয়া ছাড়া পরিকল্পনার সুফল পাওয়া যায় না।

একটি বিষয়কে দুই ভাবে উপস্থাপন করা যায়। ইতিবাচক এবং নেতিবাচকভাবে। একটি গ্লাসে অর্ধেক পানি থাকা অবস্থায় ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক দুটো পদ্ধতিতেই তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির সামনে গ্লাসটিকে উপস্থাপন করা যায়। যদি বলা হয় অর্ধেক খালি কিংবা অর্ধেক পানিশূন্য গ্লাস টেবিলের ওপর রাখা আছে তাহলে এই খালি এবং শূন্যকে আবর্তন করে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে নেতিবাচক ধারণার জন্ম হয়। আবার যদি বলা হয় টেবিলে আধা গ্লাস পানি আছে তাহলে এটি পজেটিভ তথা ইতিবাচকই শোনায়। তখন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির সামনে এটি সম্ভাবনার বিষয় হয়ে দেখা দেয় যে অন্তত তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তার সামনে আধা গ্লাস পানি রয়েছে। তেমনিভাবে একজন ছাত্র পড়ার টেবিলে বসেও ইতিবাচক চিন্তা লালন করতে পারে। যদি সে চিন্তা করে ৫টি বিষয়ের পড়া আগামীকালের ক্লাসের জন্য তৈরি করতে বসে দু'টি শেষ হয়েছে মাত্র, আরো ৩টি বাকি আছে, তাহলে তার চিন্তায় নেগেটিভিটি জন্ম নিবে। আর যদি সে এটি চিন্তা করে, আলহামদুলিল্লাহ দু'টি বিষয় আদায় হয়ে গেছে ৫টির চাপ থেকে ৩টিতে নেমে এসেছে। তার জন্য বাকি ৩টির পড়াও দ্রুত আদায় করা সম্ভব হবে। একজন পর্বতারোহী সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করতে গিয়ে যদি হিসাব করেন ১০০ মাইল উঁচু শৃঙ্গে আরোহণ করতে গিয়ে ৩০ মাইল অতিক্রম করেছি মাত্র। তখন তার জন্য সামনে অগ্রসর হওয়া কঠিন হবে। কারণ আরো ৭০ মাইল পাড়ি দেয়ার নেতিবাচক দৃষ্টি জন্ম নিবে। কিন্তু যদি এটিই হিসাব করেন যে এক শত থেকে ৩০ মাইলের দূরত্ব তিনি কমিয়ে আনতে পেরেছেন তাহলে তার ইতিবাচক এই চিন্তা অবশিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে তাকে সাহস জোগাবে। আর যদি চিন্তা করেন এখনো ৭০ মাইল অনেক দূর তাহলে তা তাকে হতাশায়ও ডুবাতে পারে। উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

বিষয় যতই কঠিন কিংবা দুঃসাধ্য হোক না কেন সাফল্য নির্ভর করে ইতিবাচক চিন্তায় বিষয়টিকে গ্রহণের ওপর। যারা ইতিবাচক চিন্তার লালন করেন তারা সকল বাধা-বিপত্তি ঝড়-ঝঞ্ঝাকে মাড়িয়ে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছাতে সক্ষম হন। আর যারা নেতিবাচক বিষয়কে অগ্রাধিকার দেন তাদের কাছে নেতিবাচক যে

www.nagorikpathagar.org

কোন বাধাই হোক না সেটা শস্য দানার তুল্য হলেও তা মূল প্রতিবন্ধক হিসেবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই নেতিবাচক বিষয়গুলোকে সেই অবস্থায়ই কিভাবে প্রতিহত করে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে হবে। কারণ ইতিবাচক মানসিকতা রাখার ওপরই নির্ভর করবে সাফল্য। জীবন চলার পথে ইতিবাচক যতগুলো বিষয় আছে তার প্রতিই বেশি নজর দেয়া দরকার। ইতিবাচক দিক এবং কল্যাণকর গুণাবলিই চলার পথকে সহজ করে দিতে পারে। নেতিবাচক চিন্তা শুধুমাত্র ত্রুটি এবং অকল্যাণকর দিকগুলোকেই সামনে বেশি টেনে নিয়ে আসে। ফলে দোষগুলোই বেশিরভাগ চোখের সামনে ভেসে ওঠে; আড়ালে থেকে যায় কল্যাণকর দিকগুলো। অনেক সময় কল্যাণকর কিংবা ইতিবাচক দিকগুলো নজরেই আসে না। মানুষের মধ্যে, প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটো দিকই আছে। কিন্তু যাদের স্বভাব শুধুমাত্র নেতিবাচক বিষয় চর্চা করে তারা সুশোভিত ফুলের মধ্যেও কাঁটার যন্ত্রণা খুঁজে বেড়ান। স্বর্গেরও ত্রুটি বের কতে ছাড়েন না তারা।

ইতিবাচক দিকগুলোকে প্রাধান্য দেয়ার অর্থ এই নয় যে নেতিবাচক দিকগুলোকে অগ্রাহ্য অথবা অস্বীকার করা হচ্ছে। বিষয়টি আদৌ সে রকম নয়। বরং নেতিবাচক বিষয়গুলোকে ইতিবাচকে রূপান্তরিত করাই ইতিবাচক দিকগুলোকে প্রাধান্য দেয়ার মূল টার্গেট। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন সারাদিন শুধু নেতিবাচক চিন্তায় নিমজ্জিত থাকেন। এরা প্রতিটি কাজেরই নেতিবাচক খুঁত বের করতে ব্যস্ত। অথচ পুরো দিনকে কাজের সফলতায় সুসজ্জিত করার জন্য ইতিবাচক চিন্তা দিয়ে কাজ শুরু করা প্রয়োজন। সামনে যা আসবে তা থেকে ইতিবাচক বিষয়গুলো নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলেই চাপা পড়ে যেতে বাধ্য নেতিবাচক দিকগুলো। কাউকে পৌঁছানোর জন্য আপনার কাছে যদি এমন দু'টি সংবাদ থাকে যার একটি ইতিবাচক আরেকটি নেতিবাচক। তাহলে আপনি আগে কোনটি জানাবেন। নিশ্চয় আগে ইতিবাচক সংবাদটিই জানানো উচিত। শুরুতেই যদি নেতিবাচক সংবাদটি উপস্থাপন করে ব্যক্তির মনমানসিকতাকে দুর্বল করে ফেলেন তাহলে দেখবেন তার কাছে ইতিবাচক সংবাদটির আর মূল্যই থাকবে না। তবে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ইতিবাচক সংবাদটি আগে দিয়ে পরে ইতিবাচক ভূমিকায় নেতিবাচক খবরটিকে উপস্থাপন করা। আপনজনের মৃত্যুর সংবাদের চাইতে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক সংবাদ আর কি হতে পারে। আমরা দেখি কেউ কেউ আপনজনের মৃত্যু সংবাদ তার প্রিয়জনকে সরাসরি বলে দেয়। ফলে হঠাৎ শোনা সবচেয়ে নেতিবাচক এই খবরে কেউ কেউ হার্টফেল তথা হৃদরোগেও আক্রান্ত হয়। কেউ কেউ শোকে বিহ্বল হয়ে মারাও যান। দেখুন নেতিবাচক সংবাদের প্রভাব কেমন মারাত্মক। অথচ নেতিবাচক খবরটিকেও ইতিবাচক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করার সুযোগ আছে।

www.nagorikpathagar.org

সমাজের চারপাশের পরিবেশ আমাদের প্রভাবিত করে। আমাদের দূরের বা কাছের মানুষের সাথে চলাফেরা, ওঠা-বসা, আচার আচরণ এমনকি কথাবার্তায় আমরা প্রভাবিত হই। অনেক সময় এতটাই প্রভাবিত হই যে, আমরা নিজেদের ভুলে যাই, নিজের চিন্তা-ভাবনার জলাঞ্জলি দেই। ভাবি হয়তো সেটাই সঠিক। প্রকৃতপক্ষে আমরা সবসময় সঠিক এবং নির্ভুল জিনিসটি বুঝতে পারি না। হয়তো পরিবেশই আমাকে সঠিক চিন্তার লালনে বাধা দেয়। আবার অনেক সময় নিজেদের চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমেও আমরা প্রভাবিত হই। তাই যত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করবো, যত ইতিবাচক চিন্তার লালনকারী মানুষের সাথে আমার চলাফেরা বা চিন্তার বিনিময় হবে ততোই ভালো রেজাল্ট আমরা পাবো। ইতিবাচক চিন্তার ফলে মানুষ নিজেকে কল্যাণের দিকে পরিবর্তন করে। সমাজে একটি বিষয় খুবই প্রকট তা হলো- আমরা অন্যের নেতিবাচক গুণ, আচার-আচরণ এবং চিন্তাগুলোকেই বেশি লক্ষ করি, সেই সাথে তাদেরকে সেই অনুপাতেই বিচার করি। কিন্তু নিজের ভেতর লুকিয়ে রাখা নেতিবাচক চিন্তাগুলোকে ধ্বংস করি না। আমি আপনি যাকে নেতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে মূল্যায়ন করি সেই মানুষের মধ্যে অনেক ইতিবাচক এবং ভালো গুণও রয়েছে সেগুলোতে আমরা খুব কমই নজর দিই। আমরা কি পারি না- অন্যের ইতিবাচক গুণগুলোকে মনে করিয়ে তাঁকে উৎসাহ দিতে। কারণ ভালো কাজের কিংবা ইতিবাচক গুণের জন্য যদি কেউ উৎসাহ পায়, তাহলে তাঁর ভেতরে আরও ইতিবাচক গুণের জন্ম হবে।

সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী কিছু তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ পর্যালোচনা করে বলেছেন, তিনটি ইতিবাচক অনুভূতির বিপরীতে একটি নেতিবাচক অনুভূতি রয়েছে। সেই অনুপাতে ৩:১ হয়। এই অনুপাতই আমাদের ভবিষ্যতের চিন্তা-ভাবনার উৎস হিসেবে মনস্তাত্ত্বিকভাবে কাজ করে। মনস্তত্ত্ববিদরা মনে করেন, মানুষের ইতিবাচক অভ্যাসই পারে ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনার জন্ম দিতে এবং ভালো কাজ করার মানসিক প্রেরণা দিতে। কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা অসচেতন থাকি। যার ভেতরে নেতিবাচক দৃষ্টির লালন বেশি হয় তিনিই মূলত অন্যের নেতিবাচক বিষয়গুলোকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করেন। আমাদের সকলেরই উচিত নেতিবাচক নয়, সবসময় ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

www.nagorikpathagar.org

গতিশীলতা

১. জ্ঞানার্জন আর সাধনার বিকল্প নেই

আধুনিক বিশ্বে এ কথা আজ দিবালোকের মতো সত্য যে, জ্ঞানই হচ্ছে মানুষের মূল শক্তি। জ্ঞানের শক্তিতেই মানুষ সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে। জ্ঞান মানুষকে দেখিয়েছে আলোকিত পথের সন্ধান। এ জন্য জ্ঞানকে একদিকে বলা হয় 'শক্তি' **(Knowledge is Power)** আবার অন্যদিকে বলা হয় 'আলো' **(Knowledge is Light)**। সভ্যতার উন্নতির মহাসড়কে আরোহণ করতে জ্ঞানই মানুষকে সহায়তা করছে। তবে শুধু জ্ঞানার্জনই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি নয় বরং জ্ঞানের সাথে সাধনার সংযোগ সাফল্য অর্জনকে নিশ্চিত করেছে। সাধনাও এমন এক শক্তি যা মানুষের অর্জনকে ধরা দিতে সহজ করে দেয়। যে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষ সাফল্য পেতে চায়, সাধনা সেই সাফল্য অর্জনে গতিশীলতা সৃষ্টি করে। জ্ঞানার্জন এবং সাধনা ব্যতীত সাফল্য অর্জনের আশা করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞানার্জন আর সাধনা একে অপরের পরিপূরক। কেউ যদি চিন্তা করে জ্ঞানার্জন আর সাধনার কোন একটি ছাড়াই সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যাবেন তাহলে তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। কারণ, জ্ঞানার্জন আর সাধনা ছাড়া সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে- "চেষ্টা সাধনা ব্যতীত মানুষের জন্য কিছুই নেই" (সূরা নাজম : ৪০)। অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "মানুষের জন্য কিছুই নেই, কিন্তু শুধু সে তাই লাভ করবে, যার জন্য সে চেষ্টা সাধনা করেছে" (সূরা ত্বা-হা : ১৫)। জ্ঞানার্জন আর সাধনা মানুষকে সাফল্যের পথ চিনিয়েছে। মহান আল্লাহ বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন, "যারা আমাদের পথে চেষ্টা-সাধনা করবে, আমরা তাদেরকে আমাদের পথ দেখাব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন" (সূরা আনকাবুত : ৬৯)।

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞানার্জন মানুষকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-অসুন্দর, সাফল্য-ব্যর্থতাকে চিনতে এবং জানতে সাহায্য করে। মানুষ কিসে সাফল্য অর্জন করবে তার পথ দেখায় মূলত জ্ঞানার্জন বা শিক্ষা। জ্ঞানার্জনকে আবর্তন করেই মানুষ বাকি সব বিষয়কে সাথে নিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছায়। যার জ্ঞান নেই তার বিবেক-বুদ্ধি কোন কাজে আসে না। সাদা-কালো, ছোট-বড়, ধনী-গরিব এগুলো মানুষের মাঝে ব্যবধানের মূল উপাদ্য বিষয় নয় বরং মানুষে মানুষে ব্যবধান গড়ে তোলে জ্ঞানার্জন। জ্ঞানী আর জ্ঞানহীন ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার : ৯)। শুধু তাই নয়, প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষ নিজের চরিত্রকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে। নিজের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে পারে। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। কল্যাণ-অকল্যাণের পথ খুঁজে নিতে পারে, আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে পারে, সর্বোপরি নিজেকে একজন সফল সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। আর নিজেকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারাটাই গোটা জীবনের মূল সাফল্য, বিরাট সার্থকতা।

জ্ঞানার্জন আর সাধনা মানুষকে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছতে সাহায্য করে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যারাই সাফল্য লাভ করেছেন, খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছেন তারা কেউ জ্ঞানার্জন কিংবা সাধনা ব্যতীত সফল হয়েছেন এমনটি ভাবার সুযোগ নেই। বরং তাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জ্ঞানার্জন আর সাধনাবলেই তারা সাফল্য লাভ করেছেন। সামান্য মানুষ হলেও নগণ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন আর সাধনার ফলে মানুষ সাফল্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। শেকসপিয়র একজন নগণ্য পরিবারের ছেলে ছিলেন, নিউটন ছিলেন চাষার ছেলে। কিন্তু জ্ঞানার্জন আর সাধনা দ্বারা তারা নিজেদেরকে আরোহণ করিয়েছেন সাফল্যের চূড়ায়। গড়ে তুলতে পেরেছেন ব্যক্তিত্ববান হিসেবে। রাজা এড্রিয়ন যখন বালক ছিলেন তখন তার অধ্যয়নের সময় আলো জ্বালানোর প্রয়োজনীয় তেলও জুটতো না। তারপরও এড্রিয়ন হাল ছাড়েননি, পরিশ্রম করে, সাধনা করে চালিয়ে গেছেন তার জ্ঞানার্জন। দিনের আলোতেই বেশি পড়া আদায় করার চেষ্টা করেছেন, আর রাতের বেলায় রাস্তার আলোতে তিনি পড়তেন। তার এই পরিশ্রম এবং সাধনাই তাকে সাফল্য এনে দিয়েছিল। বিজ্ঞানী নিউটন সাধনা আর পরিশ্রমের মাঝেই সাফল্য খুঁজেছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমার আবিষ্কারের কারণ আমার প্রতিভা নয় বরং সাধনা আর পরিশ্রমই আমাকে সার্থক করে তুলেছে" ভলটেয়ারের মতে- "প্রতিভা বলতে মানুষের মুখ্য কোন জিনিস নেই বরং পরিশ্রম কর, সাধনা কর তাহলে সাফল্য তোমার পদচুম্বন করবেই"

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞানার্জন ও সাধনা ব্যতীত ব্যক্তি ও জাতির কোন উন্নতি হয় না। জ্ঞানার্জনের সাথে যদি সাধনা যোগ থাকে তাহলে মানুষ জীবনে অনেক সাফল্য অর্জন করতে পারে। শুধু জ্ঞান থাকলেই যেমন সাফল্য অর্জিত হয় না, তেমনি শুধু সাধনা করলেই সাফল্যের দেখা পাওয়া যায় না। দুটোর মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। অর্জিত জ্ঞান দিয়ে সাফল্য বের করে আনতে সাধনার কোন বিকল্প নেই। জীবন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, প্রতিবন্ধকতার পর প্রতিবন্ধকতা পথ আগলে রাখুক না কেন জ্ঞানের সাথে ব্যক্তিকে সম্পর্ক রাখতে হবে। কারণ, জ্ঞানের চরম সার্থকতা হলো জ্ঞান সকল প্রতিবন্ধকতার দ্বার উন্মোচন করে দেয়, জ্ঞানের সাথে যোগ থাকলে কেউ ব্যক্তিকে পরাভূত করতে পারে না।

জ্ঞান মানুষের জীবনকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। মানুষের ঘুমন্ত শক্তি, বিবেক, বুদ্ধি এবং মস্তিষ্কের লুকানো ক্ষমতাকে জ্ঞান জাগিয়ে তুলে প্রকৃত সফল মানুষ হিসেবে ব্যক্তিকে তৈরি করতে সুযোগ করে দেয়। জ্ঞানার্জন আর সাধনা ব্যতীত কোন কাজে সফলতা আসে না। সারা বছর বসে থেকে যারা পরীক্ষার সময় ধুমসে পড়ে রেজাল্ট অর্জন করতে চান তারা মূলত পরীক্ষার হলে গিয়ে চোখে মুখে অন্ধকার দেখেন। জ্ঞানার্জনের এটি কোন সঠিক পদ্ধতি নয়। কারণ শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারার মধ্যেই জ্ঞানার্জনের মূল সার্থকতা নেই। বরং বলা হয়েছে জ্ঞান এমন একটি জিনিস 'যেখানে যা পাবে সেখান থেকেই তা আহরণ করবে'। পড়া মুখস্থ করতে গিয়ে যেটাকে পাহাড়সম মনে হচ্ছে সেটা যদি নিয়মিত পড়া হতো, সেই ক্লাসে অংশগ্রহণ করা হতো, তাহলে এটিকে পানির মত সহজ মনে হতো। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি' কবিতার এই দু'টি লাইন জিজ্ঞেস করলে কে এমন আছে বলতে পারবে না। আসলে এই দু'টি লাইনের চর্চা এতো বেশি হয়েছে যে ব্যক্তি বুড়ো হওয়ার পরও তা ভুলে যায় না। আমরাও যদি আমাদের জ্ঞানের চর্চা এমন করে যতবেশি বাড়াতে পারবো ততবেশি আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে। এ জন্য আমাদের প্রয়োজন পড়ার সময় পড়া, প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন আদায় করা, নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণ করা। তখন আর পরীক্ষার পূর্বে পড়াকে পাহাড়সম মনে হবে না। আর পরীক্ষার হলেও চোখ মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে না। মূলত শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন এমন জিনিস দূর থেকে কঠিন মনে হবে কিন্তু কাছে এসে তা গ্রহণ শুরু করলে মনে হবে জ্ঞানার্জন অতি সহজ।

জ্ঞানার্জন আর সাধনার পেছনে বিশ্বের মহামনীষীরা কিভাবে ছুটেছেন তা একটু খেয়াল করলেই কারো বুঝতে কষ্ট হবে না। জ্ঞানের পেছনে শ্রম ঢেলে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও যিনি দমে যাননি তিনি হলেন দার্শনিক আল রাযী। তিনি প্রায় ২০০টি

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার আল জুদারি ওয়াল- হাসানাহ নামক পুস্তিকাটি শুধু ইংরেজিতেই চল্লিশবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তার বিনয়ী কথায়ই প্রকাশ পায় তিনি জ্ঞানার্জনে কতটা অদম্য ছিলেন। তিনি বলেন, জ্ঞান সাধনায় আমার অদম্য উৎসাহের ফলেই মাত্র এক বছরে আমি কুড়ি হাজার পৃষ্ঠার মৌলিক রচনা লিখেছি (প্রতিদিন প্রায় ষাট পৃষ্ঠা)। দিবা-রাত এমন কঠোর পরিশ্রম করেছি যে, শেষে আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলি। তবু আজও আমি অন্যকে দিয়ে বই পড়িয়ে শুনি কিংবা আমার রচনা লেখাই। প্রখ্যাত পন্ডিত আল কিন্দি একাধারে বারটি স্বতন্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরও ছয়টি ভাষাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং প্রায় ২৬৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আল ফারাবিও জ্ঞানের পেছনে ব্যাপক শ্রম দিয়েছেন। তিনি দশটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং ৬টি স্বতন্ত্র বিষয়ে তার অগাধ পান্ডিত্য ছিল। প্রায় ৭০টি বিরাট নোটবুকে দর্শনশাস্ত্রের সারাংশ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও পন্ডিত আল তাবারি ক্রমাগত চল্লিশ বছর যাবৎ দৈনিক ৪০ পৃষ্ঠা করে মৌলিক রচনা লিখতেন। যার যোগফল দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ লক্ষ ৮৪ হাজার পৃষ্ঠা। ফারাবি এরিস্টটলের আত্মা সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি একশতেরও বেশিবার এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়টি ৪০ বার পাঠ করেছিলেন। ১৮৭৯ সালের ২১ অক্টোবর বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন প্রথম বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তার এই আবিষ্কারের পেছনের ইতিহাস অত্যন্ত কঠোর সাধনা আর পরিশ্রমের। কারণ তিনি ১০ হাজার বার চেষ্টা করে তবেই সাফল্য পেয়েছিলেন বাল্ব তৈরি করতে। আর তাইতো তিনি বলেছেন, "কাজের ক্ষেত্রে প্রতিভা প্রেরণা জোগায় মাত্র এক ভাগ আর বাকি ৯৯ ভাগ প্রেরণাই আসে পরিশ্রম ও সাধনা থেকে" জাপানিরা বিশ্বের বুকে আজ সফল জাতি, তার পেছনের কারণ তারা কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে। কারো সাথে দেখা হলে জাপানিদের সম্বোধন 'কেমন ঘামছেন?' প্রমাণ করে তারা পরিশ্রমী। বিশ্বের এক নম্বর শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে খ্যাত জাপানে প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার মানুষ অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে মারা যায়, অথচ তার উল্টো জরিপ করলে দেখা যায়, অলসতার কারণে পৃথিবীতে অনেক মানুষ মারা যায়।

সাধনা ছাড়া দুনিয়াতে কেউ কোন কিছু অর্জন করতে পারেননি। রাসূল (সা) নবুওয়তের আগে ১৫ বছর ধ্যান করেছেন, ১৩ বছর প্রচন্ড ধৈর্যসহকারে দাওয়াত দিয়েছেন, আর ১০ বছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন ইসলামের পূর্ণতার। রাসূল (সা)-এর এমন সাধনাই সকল মত ও পথের ওপর ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে সমাজে বিজয়ী হয়েছিল। ইমাম বুখারী (রহ) হাদিসের সেরা গ্রন্থ বুখারী শরিফ রচনা করতে গিয়ে একটি হাদিস সংগ্রহে ৩ শত

www.nagorikpathagar.org

মাইল হেঁটেছেন। স্পেলার বলেছেন, "প্রতিভা বলে কিছু নেই। সাধনা করো সিদ্ধিলাভ একদিন হবেই" নোবেল বিজয়ী লিও টলস্টয়কে বলা হয়েছিল জাতীয় উন্নয়নের জন্য আপনি যুবসমাজের প্রতি কিছু বলুন। তিনি বলেছিলেন, আমার তিনটি পরামর্শ আছে- পড়ো, পড়ো এবং পড়ো ।

ওহির প্রথম বাণীই ছিল জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়ে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা আলাকের ১নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন" আর পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-কেও আল্লাহ্ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে, "আল্লাহ্ তায়ালা আদম (আ)-কে সকল বস্তুর নাম শিখিয়ে দিলেন" (সূরা বাকারা : ৩১)। মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল (সা) বলেছেন, "জ্ঞান হচ্ছে মুসলমানদের হারানো সম্পদ" জ্ঞানের শক্তিবলেই মুসলমানরা সমগ্র দুনিয়া শাসন করেছিল। রাসূল (সা) আরো বলেছেন, "জ্ঞান হচ্ছে তোমাদের হারানো সম্পদ, সুতরাং যেখানে পাও তা কুড়িয়ে নাও" হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয" (জামেউস সগির) (ইবনে মাযাহ)। হযরত আলী (রা)- এর ব্যক্তিগত হাদিস সঙ্কলন 'সহিফা' সংরক্ষিত থাকতো সর্বদা তার তলোয়ারের খাপের ভেতর। আমেরিকার তৎকালীন সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অন্য লোকদের সাথে কথোপকথনের সময়ও ফাঁক দিয়ে বই পড়তেন এবং ভ্রমণের সময় প্রতিদিন প্রায় তিনটি করে বই পড়তেন। নেপোলিয়ান যুদ্ধে গেলেও সাথে থাকতো চলমান বইয়ের লাইব্রেরি এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বই পড়তেন। মহাত্মা গান্ধী যেখানে গোসল করতেন সেখানে প্রতিদিন একটি করে গীতার শ্লোক লিখে রাখতেন। গোসলের সময় তা গানের সুরে মুখস্থ করে ফেলতেন।

সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব সব কিছুই জ্ঞানের শক্তিবলে মানুষ অর্জন করেছে। অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা জ্ঞানই মানুষকে দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের সাথে যুক্ত ছিল সাধনা। সাধনা আর জ্ঞান মানুষের সকল সাফল্য অর্জনের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাই জ্ঞানের পাশাপাশি সাধনার কোনো বিকল্প নেই। ইমাম গাযযালী (রহ) বলেছেন, "সাফল্যের অপর নামই অধ্যবসায়"

www.nagorikpathagar.org

২. কথা ও কাজে ভারসাম্য রাখুন, কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী হোন

জীবন পরিচালনায় মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়। মানুষের জীবনের সাথে কাজের সম্পর্ক চাকার মতো কারণ চাকা যেমনিভাবে ঘুরে তেমনি ভাবে ঘুরতে থাকে জীবন চাকা (সময়)। এ জন্য মানুষের জীবনকে চাকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রত্যহ একজন মানুষের জীবন চাকার মত ঘুরপাক খায়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক কত কাজইতো মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনে করতে হয়। এসব কাজ করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারার ওপরই নির্ভর করে সফলতা। মানুষের জীবনচলার পথে হাজারো কাজের মধ্যে এমন কিছু মৌলিক কাজ আছে যেগুলোতে ভারসাম্য রক্ষা করা অতীব জরুরি। তার মধ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কথা ও কাজের ভারসাম্য রক্ষা করা। কারণ কথা ও কাজের ভারসাম্যহীনতা গোটা জীবনটাকেই বিফল ও মর্যাদাহীন করে দেয়।

কথা বলা আর কাজ করা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। কথা বলা মানে কাজ করা নয় বরং এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যও অনেক বিস্তর। শুধু তা-ই নয়, কথা বলা আর কাজ করার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করার মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে। শুধু কথা বলেই কাজের সাফল্য অর্জিত হয় না। কোনো কথা বললে, কিংবা কোনো কাজের জন্য মনোভাব প্রকাশ করলেই যে কাজ হয়ে যাচ্ছে এরূপ মনে করারও কোনো কারণ নেই। আমরা অনেককেই দেখি কথায় খুব পণ্ডিত কিন্তু কাজের বেলায় আমড়া কাঠের ঢেঁকি। তাই কথার পাণ্ডিত্য দিয়ে সাফল্য অর্জিত হয় না বরং কাজের মাধ্যমেই সম্ভব সাফল্য অর্জন। আমরা যদি কথা দিয়েই সব কিছু জয় করতে চাই তাহলে ক্ষণস্থায়ী কিছু ফল হয়তো মিলতে পারে কিন্তু সাফল্য আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে যদি কাজ করা না হয়।

সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি হলো কথায় ও কাজে ভারসাম্য রক্ষা করা। কথা এবং কাজের মধ্যে যার ভারসাম্য নেই সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রেও তিনি থাকেন ভারসাম্যহীন। ভারসাম্যহীনতা সফলতার পরিবর্তে ব্যর্থতার ধ্বনি শোনায়। কথা-কাজসহ জীবনের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ভারসাম্যহীনতা সফলতার সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। চাই সেটা কথা ও কাজের মধ্যে কিংবা জীবনাচরণের অন্য কোনো মৌলিক বিষয়ে হোক না কেন। পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজেদেরকে সফল এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করেন এবং লোকজনও তাদেরকে সফল মানুষ বলেই ভাবে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে দেখা যায় তাদের কথা ও কাজের ভারসাম্যহীনতা তাদেরকে অতিদ্রুত পতনের গহবরে নিয়ে যায়। কথা ও কাজের ভারসাম্যহীনতা যেমন একজন ব্যক্তিকে পতনের গহবরে নিক্ষেপ করে তেমনি সম্পদের ভারসাম্যহীন খরচ একজন বিত্তশালীকে দেউলিয়া করে

www.nagorikpathagar.org

দেয়। ঠিক তেমনিভাবে ভারসাম্যহীন খাওয়ার কারণে স্বাস্থ্যের হানি হয়, ভারসাম্যহীন আচরণের কারণে মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। আর এটিতো সবারই জানা আমাদের সমাজে ভারসাম্যহীন কথাবার্তা যে বলে তাকে সবাই পাগল বলে। সমাজে পাগলের অবস্থান আমাদের সবার কাছেই স্প”

আমাদের সমাজে এমন অনেকেই আছেন যারা কথার খই ফোটাতে জানেন কিন্তু প্রকৃত সত্য তার বিপরীত। এসব লোকের কথায় মনে হয় তারা যেন মানবতার কল্যাণের দূত। তারাই একমাত্র মানুষের কল্যাণকামী। তাদের কথাগুলো মনে হয় যেন বিজ্ঞজনের মতো। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে এদের আচরণ মোনাফেকদের মতো। এরা জনসম্মুখে মানবতার কথা বলে, মনুষ্যত্বের প্রতি আবেগ আর দরদ দেখায়, বিপরীতে এরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলে অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এদের প্রসঙ্গে হজরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, উম্মতের মধ্যে ঐ সমস্ত মোনাফেক লোকের ব্যাপারে ভয় হচ্ছে, যারা বিজ্ঞজনের মতো কথা বলে আর অত্যাচারীর মতো কাজ করে। (বায়হাকি)

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম। মুসলিম জাতিকে আল্লাহ পাক ভারসাম্যপূর্ণ জাতি (উম্মাতান ওয়াসাতান) হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে এসেছে, “আর এভাবেই আমরা তোমাদের একটি মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হতে পার। আর রাসূল সাক্ষী হবেন তোমাদের ওপর” (সূরা বাকারা :১৪৩)। মানবতার ধর্ম ইসলামের বিধানে তাই কথা দিয়ে তা ভঙ্গ করা তথা কথা ও কাজে ভারসাম্যহীনতার কোনো সুযোগ নেই। শুধু ইসলাম কেন, পৃথিবীর কোনো ধর্মই কথা ও কাজের মিল না থাকাকে সমর্থন করে না। ওয়াদা বরখেলাপ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং কথা দিয়ে কথা না রাখা প্রতারকের কাজ। আর প্রতারণা কোনো ধরনের ধর্মই সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআনে ওয়াদা পালনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কুরআনে এসেছে, “আর সত্যপরায়ণ তারাই যারা ওয়াদা দিয়ে তা পূর্ণ করে” (সূরা বাকারা : ১৭৭)। “কুরআনে আরো এসেছে, এবং প্রতিশ্রুতি পালন করবে, প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে কিয়ামতের দিন অবশ্যই কৈফিয়ত তলব করা হবে” (সূরা বনি ইসরাইল : ৩৪)।

কথা ও কাজে ভারসাম্যহীনতাকে সরাসরি মিথ্যাই বলা চলে। ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যা একটি মারাত্মক অপরাধ বা কবিরা গুনাহ। আর মিথ্যা মোনাফেকিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত। সমাজে যিনি সাফল্য পেতে চান তার চরিত্রের পাশে

www.nagorikpathagar.org

যদি মোনাফিক শব্দটি থাকে তাহলে তার অর্জিত সাফল্যও ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। হাদিসে রাসূলে (সা) মোনাফিকের ৩টি লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে– ১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে ২. ওয়াদা করলে বরখেলাপ করে এবং ৩. আমানতের খিয়ানত করে। (বোখারি শরিফ)

সমাজে এ রকম কিছু ব্যক্তি আছেন যারা কথা ও কাজে ভারসাম্য রাখেন না এবং হরহামেশা মিথ্যা বলেন। আবার কেউ তাকে মোনাফেক উপাধিও দেয় না। তখন এরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন আর ভাবেন তাদের থেকে চালাক দুনিয়াতে আর কেউ নেই। তারা ভাবেন তাদের কথা ও কাজের ভারসাম্যহীন এই আচরণ কেউ কখনো ধরতে পারবে না। কিন্তু এসব লোকের জেনে রাখা উচিত তাদের সম্পর্কে সবাই বেখবর নন। তাদের ব্যাপারে অনেক মানুষই জানেন। মানুষের মন থেকে কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা কিংবা শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় না। আর দুনিয়ার জীবনে পার পেলেও পরকালীন জীবনে তাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। কারণ আর কেউ তাদের আচরণ না বুঝুক কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তো তাদের ঠিকই দেখছেন। যারা নিজেরা যা বলে তা করে না, তাদের প্রতি আল্লাহর রয়েছে প্রচণ্ড ক্রোধ। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা বল তা নিজেরা কর না কেন? আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার এই যে, তোমরা যা বল তা বাস্তবে কর না" (সূরা সফ : ২)।

অগনতি শ্রোতার সামনে খুব সহজেই শ্রুতিমধুর বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়। কখনো জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়ে অগনতি শ্রোতাকে উদ্বেলিত করা যায়। আবার কখনো মনোমুগ্ধকর যুক্তিনির্ভর বক্তব্য দিয়ে উপস্থিত শ্রোতাকে বিমোহিত করা সহজ। কিন্তু নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করাটাই আসল বিষয়। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যে নসিহত বা বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো তা কতটুকু বক্তা তার নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন। যিনি বক্তা তিনি যে কথাগুলো শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন তা যদি বক্তার বাস্তব জীবনেই অনুপস্থিত থাকে তাহলে এ বক্তব্যের সার্থকতা কোথায়। বরং কাল কিয়ামতের ময়দানে এসব বক্তাকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। হজরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি মিরাজের রাত্রে কিছু লোক দেখেছি যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাইল, এসব লোক কারা? তিনি বললেন, আপনার উম্মতের ঐ সব বক্তা, যারা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দিত এবং নিজেরা সে কাজ করতে ভুলে যেত (মেশকাত)। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা

www.nagorikpathagar.org

লোকদের যে কাজ করার নির্দেশ দাও, তা তোমরা নিজেরা করতে ভুলে যাও" (সূরা বাকারা : আয়াত ৪৪)।

পৃথিবীতে যারা সফল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত তারা কখনো কথার খই ফুটিয়েই এ পর্যায়ে উপনীত হননি। বরং তারা কথার চেয়েও কাজ করেছেন বেশি। কথা ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রেখে জীবন পরিচালনা করেছেন। কথা বলে অন্যকে দিয়ে কাজ করানোর চাইতে নিজেদের কাজ নিজেরা করাই বেশি শ্রেয়। সমাজসংগঠনে তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন যিনি তার অধীনস্থকে কাজের নির্দেশ দেয়ার আগে নিজেই কাজে নেমে পড়েন এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত হন। এসব ব্যক্তি সবার ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হন। আসুন আমরাও কথা ও কাজে ভারসাম্য রক্ষা করি, কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী হই।

৩. সাহস আছে যার সাফল্যের বিজয়মুকুট তার

পৃথিবীটা সত্যিই সাহসী মানুষের জন্য। ভিতু কাপুরুষের জন্য পৃথিবীটা আজাবের কারাগার। সাহস নিয়ে হিম্মতের সাথে পথ চলতে পারলে সফলতা সুনিশ্চিত। আর ভয়ে ভিতু হয়ে চলার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। যারা সাহস নিয়ে পথ চলেছে তারাই পৃথিবীকে জয় করতে পেরেছে। যুদ্ধজয় থেকে শুরু করে সমুদ্রজয়, পর্বতারোহণ কিংবা বিশ্বজয়– সকল ক্ষেত্রেই সাহসী মানুষ সুখের হাসি হেসেছে। আর ভিতুরা পলায়নপর হয়ে নিজেদের মধ্যেই নিজেরা হারিয়ে গেছে। সাহস যে শুধু যুদ্ধ কিংবা বিশ্বজয়ের জন্য প্রয়োজন তেমনটিই শুধু নয় বরং ছোট হোক কিংবা বড়-প্রতিটি কাজেই সাহসের প্রয়োজন আছে। নিজের মতপ্রকাশেও সাহসিকতার প্রয়োজন হয়। কারণ সাহস না থাকলে সত্য আড়ালে থেকে যায়, ধামাচাপা পড়ে যায়। সাহস করে সত্য কথা বলতে পারা আর চুপ থাকা দুটোর মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বরং চুপ থেকে শুধু মনে মনে ঘৃণা করাকে ঈমানের দুর্বলতম স্তর বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, "তোমরা কেউ যখন কোনো খারাপ কাজ হতে দেখবে তখন হাত দ্বারা বাধা দেবে, যদি সেই সামর্থ্য না রাখ, তাহলে মুখ দিয়ে নিষেধ করবে, যদি এ সামর্থ্যও না রাখ, তাহলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা (প্রতিহত) করবে। আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম স্তর" (মুসলিম)।

www.nagorikpathagar.org

শুধুমাত্র চুপ থেকে মনে মনে ঘৃণা করে যেমন খারাপ কাজকে বন্ধ করা যায় না, তেমনি সাহস না থাকলে মিথ্যার ওপর সত্যকে বিজয়ীও করা যায় না। পৃথিবীতে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। মিথ্যাবাদীরা নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে সত্যবাদীদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রাখতে চায়। কিন্তু তারা ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি সত্যবাদীরা সাহসী হয়। জুলুম-নির্যাতন আর নিপীড়নকে উপেক্ষা করে সত্যের পথে অবিচল টিকে থাকতে পারে সে, যে সাহসের সাথে হিম্মতের দ্বারা পথ চলতে পারে। তাইতো রাসূল সাঃ সাহস করে সত্য বলতে পারাকে উত্তম জিহাদ বলেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন- অত্যাচারী শাসকের সামনে সাহস করে সত্য কথা বলা হচ্ছে উত্তম জিহাদ। (তিরমিজি)

ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত সাহসী একজন মানুষ ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রা)। তার নির্ভীক সাহসিকতাই তাকে অর্ধ পৃথিবীর শাসক বানিয়েছিল। অর্ধ পৃথিবীর নেতৃত্ব ও রাজত্ব করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন সাহসের সাথে পথ চলতে পারার কারণেই। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি যেমন সাহসী ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর তার সাহস একটুও কমেনি বরং তা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কাফিরদের জুলুম-নির্যাতনের কারণে প্রকাশ্যে যেখানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, সেখানে ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা)-ই প্রথম কাবার চত্বরে উচ্চস্বরে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন তার ইসলাম গ্রহণের কথা। যেটা অন্য কারো পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যপার ছিল। শুধু কি তাই? তিনি তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মক্কার কোরাইশদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পবিত্র কা'বা ঘরে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করেন। ওমর (রা)-এর এমন সাহসিকতায় মক্কায় ইসলাম প্রচারে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। হযরত ওমরের ভয়ে পাপিষ্ঠ আর মোনাফিকরা থরথর করে কাঁপত। তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস কেউ রাখত না। ওমর (রা) মানেই একজন দুঃসাহসী মানুষের নাম। ওমর মানেই নির্ভীকচেতা এক আদর্শ মানব। একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা)-কে ছাড়া তিনি আর কাউকেই পরোয়া করতেন না। ভয় নামক শব্দটিকে যিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে জানতেন তিনিই হযরত ওমর (রা)। ভয়ে ভীত না হয়ে ওমর (রা) সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছিলেন তার প্রতিফলন ঘটেছিল ইসলাম প্রচারে।

'সাহস আছে যার সাফল্যের বিজয়মুকুট তার'– এ কথাটি বাস্তবিক অর্থেই সত্য। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে এক সাহসী যুবকের বিজয় অভিযান সে কথারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছিল। সাহসের সাথে লড়াই করে মাত্র ১৭ বছর বয়সেই সিন্ধু বিজয় করে সেই অবিস্মরণীয় বিজয় উপাখ্যান যে যুবক রচনা করেছিলেন তিনি আর

www.nagorikpathagar.org

কেউ নন, তিনি হলেন তরুণ উমাইয়া সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো এক তরুণ যুবকের সাহসী বিজয় উপাখ্যান শুধুমাত্র সিন্ধুকেই পদানত করেনি বরং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বিজয়কেতন উড়ানোর শুভ সূচনা করেছিল। অথচ তার আগে কোনো মুসলিম বীর ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সিন্ধু অভিযানে সাফল্য অর্জনে সামর্থ্য হয়নি। এক মুহাম্মদ বিন কাসিমের উদ্দীপ্ত সাহসী চেতনা পাল্টে দিয়েছিল বিশাল ভূখন্ডের অগনতি মানুষের জীবনচরিত্রকে। কিশোর কাসিম তাই অকুতোভয় সাহসের জন্য উপাধি পেয়েছিলেন মহাবীরের।

শুধুমাত্র মুহাম্মদ বিন কাসিম কেন? পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে যারাই সাহসের সাথে পথ চলেছেন সাফল্যের বিজয়মুকুট তারাই পরেছেন। কত বেশি নির্ভীক এবং অসীম সাহস থাকলে তারিক বিন জিয়াদের মত একজন সেনাপতি মাত্র গুটিকয়েক নিরস্ত্র সৈন্য নিয়ে রাজা রডরিকের ১ লক্ষ ২০ হাজার সশস্ত্র সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্পেনের মত রাজ্য বিজয় করতে পারেন! ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুলাই মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ মাত্র ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে যে ঐতিহাসিক বিজয় ছিনিয়ে আনেন তা সাফল্যের স্বর্ণশিখরে লিখিত থাকবে কাল থেকে কালান্তর। প্রতিটি বিজয়ই রোমাঞ্চকর। কিন্তু সব বিজয়েই উপাখ্যান রচিত হয় না। স্পেন বিজয় করতে গিয়ে তারিক বিন জিয়াদ যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা শুধুমাত্র ইতিহাসে নয়া উপাখ্যানই রচনা করেনি বরং বিস্মিত করেছে গোটা বিশ্বকে। অত্যাচারী রাজা রডরিকের সৈন্য সংখ্যা তাকে মোটেও বিচলিত করেনি। বরং তিনি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে সাগর উপকূলে স্পেনের মাটিতে পা রেখেই সব সৈন্যকে নামিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন তাদের বয়ে আনা জাহাজগুলো! তারপর সৈন্যদের লক্ষ্য করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, প্রিয় বন্ধুগণ, আমাদের পিছু হটবার বা পলায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সম্মুখে দুশমন আর পশ্চাতে সমুদ্র। আমাদের সামনে এখন স্পেন আর অত্যাচারী রডরিকের বিশাল বাহিনী আর পেছনে ভূমধ্যসাগরের উত্তাল জলরাশি। আমাদের সামনে দু'টি পথ খোলা। হয় লড়তে লড়তে জয়ী হওয়া, শাহাদতের মর্যাদায় সিক্ত হওয়া কিংবা সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কাপুরুষের মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। সেদিন সাহস দীপ্ত ভাষণে অনুপ্রাণিত তার সাথীরা কাপুরুষোচিত মৃত্যুকে পায়ে ঠেলে শাহাদতের তামান্নায় উজ্জীবিত হয়ে বীরবিক্রমে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল। তারিক বিন জিয়াদের সেই সাহসী সিদ্ধান্ত গোটা স্পেনে ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

সাহস থাকলে ছোট্ট কিশোররাও বিজয়মুকুট ছিনিয়ে আনতে পারে। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছোট্ট দুই কিশোর সাহাবী হযরত মুয়াজ বিন আমর (রা) এবং মায়াজ বিন আফরা (রা)। যারা বুকে দুর্দান্ত সাহস নিয়ে বদরের যুদ্ধে ইসলামের চিরশত্রু দুর্ধর্ষ কোরাইশ যোদ্ধা ও কাফিরদের প্রধান সেনাপতি আবু জাহেলকে খতম করেছিলেন। ছোট্ট দু'জন কিশোর মিলে অসীম সাহসিকতার যে পরিচয় বদরের প্রান্তরে সেদিন দিয়েছিলেন তা সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা। বুকে সাহস সঞ্চারিত না হলে দুই কিশোর সাহাবীর পক্ষে সেদিন আবু জাহেলের মত দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকে খতম করা সম্ভব হতো কি!

দুঃসাহসী আরেক সাহাবীর নাম হযরত আলী (রা)। দুর্দান্ত সাহসিকতার জন্য এই বীরকেশরীকে 'শেরে খোদা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিলো। হযরত আলী (রা) যেমন ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা তেমনি ছিলেন জ্ঞানী ও বিদ্বান। শৌর্য-বীর্যের জন্য তিনি 'আসাদুল্লাহ' বা 'আল্লাহর সিংহ' উপাধিতে ভূষিত হন। এই বীর সাহসী যোদ্ধা ৩০টি সশস্ত্র জিহাদে বিজয় লাভ করেন। একইভাবে বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-কে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারি উপাধি দেওয়া হয়েছিল। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) ছিলেন মুসলিম ইতিহাসে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক মহান সেনাপতি। যিনি রণক্ষেত্রে নিজের সাহস ও শক্তি দ্বারা বাতিলের মূলোৎপাটন করে তাওহিদের ঝান্ডাকে বুলন্দ করেছিলেন। মুতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতিকে হারিয়ে মুসলিম বাহিনী যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে সিপাহসালার নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে খালিদ (রা) অসীম সাহস ও অপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করে কালিমার বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। এ যুদ্ধে খালিদ (রা)-এর ৯টি তরবারি ভেঙে গিয়েছিল। রাসূল (সা) তাঁর এই তেজস্বিতা ও সাহসের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারি উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত খালিদ (রা) এমন এক সাহসী যোদ্ধা ছিলেন যে, কোনো যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হননি।

সাফল্যের বিজয়মুকুট ছিনিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন সাহসিকতা; যেমন সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ওমর, আলী, খালিদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম আর তারিক বিন জিয়াদের মতো দুঃসাহসী মানুষেরা। প্রতিটি সাফল্যেই সাহস ও হিম্মত তাদের পথচলায় গতি সঞ্চার করেছিল। তাই কৃতিত্ব কিংবা সাফল্য অর্জনে সাহসের সাথে পথ চলার বিকল্প নেই। তবে খালি মাঠে গোল দেওয়া যেমন কৃতিত্বের নয় তেমনি নিরস্ত্র নিরীহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পরাভূত করে বিজয় ছিনিয়ে আনাকে সাফল্যের বিজয়মুকুট অর্জন বলা যায় না। উত্তাল

www.nagorikpathagar.org

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দেয়া ছাড়া যেমন একজন নাবিককে দক্ষ ও সাহসী নাবিক বলা যায় না, তেমনি কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া, বাধা অতিক্রম করা ছাড়া বিজয়ী হওয়াকে সাহসিকতার পরিচয় বলে নির্ণয় করা যায় না। ভয়কে জয় করে অসাধ্যকে সাধন করে বিজয়ী হওয়াই হলো সাহসিকতার মূল পরিচয়।

৪. জীবন বদলে যাবে

মানুষ জীবন বদলাতে কত প্রচেষ্টাই না করে। জীবনকে সাফল্যের কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌছানোর লক্ষ্যে চলে মানুষের অবিরাম সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রাম অবিরাম চললেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য মানুষ পায় না। এই কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌছতে না পারার কারণ বিশ্লেষণ করলে যে কয়টি মূল বিষয় সামনে উঠে আসে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। একটি সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে দিতে পারে মানুষের জীবন। যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়েও কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌছাতে পারেন না তারা যদি সত্যিকারার্থে কাজের শুরুতেই সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সাফল্য তাদের পদতলে আশ্রয় নেবে। ইংরেজি ভাষায় দৃষ্টিভঙ্গি শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। ইংরেজিতে একে বলে **'Attitude'**। ব্যক্তিজীবনে সফলতার নিশ্চয়তা এই **Attitude**। আর সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হলো কাজের উপযোগী, কর্মস্থলের উপযোগী, জীবিকার উপযোগী **Positive** দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা।

যিনি একজন ছাত্র তার একাডেমিক ক্যারিয়ারে দৃষ্টিভঙ্গি যদি ছাত্রসুলভ না হয় তাহলে তার ক্যারিয়ার কখনো সমৃদ্ধ হতে পারে না। একজন ছাত্রের সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হবে পড়া পড়া আর পড়া। পড়াশোনা করে হতাশা কাটিয়ে ব্যর্থতা ছাড়িয়ে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ছোঁয়া। তেমনিভাবে একজন শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে উত্তম পাঠদানে সুশিক্ষিত জাতি গড়ে তোলা। সেক্ষেত্রে শিক্ষাদানের পরিবেশ যদি ছাত্রদের প্রতি শিক্ষাসুলভ, স্নেহসুলভ এবং প্রয়োজনে শাসনমূলক না হয়, তাহলে তিনি প্রকৃত পাঠদানে ব্যর্থ হবেন। ছাত্ররা বঞ্চিত হবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থেকে। উন্নত জাতিগঠনের কর্মসূচি চরমভাবে ব্যর্থ হবে। ঠিক এমনিভাবেই কোনো প্রশাসক ভালো প্রশাসক হতে পারেন না যতক্ষণ না তার দৃষ্টিভঙ্গি সুসম্পন্ন হয়। মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি যদি মাতৃসুলভ, বাবার দৃষ্টিভঙ্গি যদি পিতৃসুলভ না হয় তাহলে বাবা-মা কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা অনুযায়ী সন্তান গড়ে তুলতে পারেন না। মালিক যদি কর্মচারীদের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ না করেন আর কর্মচারীরাও যদি কাজের ক্ষেত্রে সুদৃষ্টি না দেন তাহলে শ্রমিক-

www.nagorikpathagar.org

মালিকের মাঝে বৈরী সম্পর্ক তৈরি হয়। আর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিই সার্বিক উৎপাদন, উপার্জন এবং সাফল্য ধ্বংস করে দিতে বাধ্য। সাংগঠনিক জীবনে একজন সংগঠকের সুসম্পন্ন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই সংগঠনের কাঙ্ক্ষিত সফলতা নির্ভর করে। সমান যোগ্যতা, আন্তরিকতা এবং পরিশ্রম ঢেলে দেয়ার পরও দু'জন দু'রকম সাফল্য পান। এর কারণ হলো কাজের শুরুতে একজন সুসম্পন্ন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন, আর আরেকজন দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি আমলেই নিতে চান না। ব্যক্তিজীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি লালন না করলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌঁছাতে পারেন না। কারণ সাফল্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৮৫ ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তি সফলতা পায় তার সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে।

সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি জন্মলব্ধ কোনো বিষয় নয়, এটি মনোভাবের পরিবর্তনের মাধ্যমে ধারণ করে লালনের বিষয়। কেউ কেউ ভাবতে পারেন অমুক বিরাট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, তাই তার দৃষ্টিভঙ্গি তো সুসম্পন্ন হবেই এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সমান মনোভাবের (ফিতরাতের) ওপরই জন্মগ্রহণ করে। সবাই হাত, পা, কান ও মাথা নিয়ে মানুষ হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে। রাসূল (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন, সকল মানুষ একই ফিতরাত বা স্বভাবের ওপরই জন্মগ্রহণ করে, এরপর তার পিতা-মাতা এবং তার পরিবেশ তাকে সে অনুযায়ী পরিচালিত করে। আবার বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে মানুষ মানেই শুধুমাত্র দুটো হাত, দুটো পা কিংবা একটি শরীর গঠনের নাম। বরং হাত পাসহ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মেধা-মনন মিলিয়েই একজন সম্পূর্ণ মানুষ। এই সব কিছুর সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গিই একটি সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। সত্যিকারার্থেই কোনো মানুষ সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জন্মায় না বরং তার দেহ, মন চিন্তা চেতনার সম্মিলিত ইতিবাচক যোগফলই সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে পরিবেশ, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং নিজ প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতেই একটি সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে পারে। উপরিউক্ত চারটি বিষয়ের প্রভাবে অনেক সময় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়ে সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তিরত হয়। বদলে যায় ব্যক্তির পুরো জীবন। পরিবেশ ব্যক্তির সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যিনি সুন্দর পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তার দৃষ্টিভঙ্গি হয় সুসম্পন্ন আর যার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নেতিবাচক হয় তার দৃষ্টিভঙ্গি সুসম্পন্ন হয় না। এটি সাধারণ নিয়ম হলেও সমাজে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। যারা স্রোতের বিপরীতে চলতে জানেন, যাদের

www.nagorikpathagar.org

মাঝে অদম্য ইচ্ছা এবং সাহস থাকে তারা নেতিবাচক পরিবেশের মাঝে নিজের সার্বিক প্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে পুরো জীবনটাকেই বদলে দিতে পারেন। একটি সুন্দর পরিবেশে একজন মানুষ যখন বেড়ে ওঠে তখন তার দৃষ্টিভঙ্গি সুসম্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরিবারের সুন্দর পরিবেশ সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সহায়ক। সহপাঠীদের সুন্দর আচরণ একজন ছাত্রকে সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। কর্মক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিকের সুসম্পর্কের পাশাপাশি সহযোগীদের সাথে সুসম্পর্ক এবং কর্মক্ষেত্রের সুন্দর পরিবেশ সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে সহায়তা করে। পরিবেশ যে কতখানি সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করে তার প্রমাণ আপনাদের আমাদের আশপাশে অহরহই রয়েছে। পাশাপাশি দু'টি খাবার হোটেলের ক্ষেত্রে দেখা যাবে একটি হোটেলের মালিক কর্মচারী এবং এর কাস্টমারদের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি অভদ্রজনিত। ঠিক পাশেই আরেকটি হোটেলে দেখা যাবে সেখানকার মালিক কর্মচারী যেমন রুচিশীল ও ভদ্র তাদের কাস্টমাররাও রুচিশীল এবং ভদ্র ধরনের। এটি শুধুমাত্র তাদের সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হয়েছে আর এই সৌন্দর্য তৈরিতে পরিবেশই তাদের সহায়তা করেছে। একই দেশের দু'টি রাজনৈতিক দলের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে একটি তার প্রতিপক্ষকে নোংরা, হিংসাত্মক এবং নীচু ভাষায় বক্তব্য দিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। এই নোংরা চর্চা দলের নিম্নস্তর থেকে শুরু করে মধ্যস্তরকে পেরিয়ে অনেক সময় দলের প্রধানেরও ভাষা হয়ে যায়! আর আরেকটি দলকে দেখা যায় একই বিষয়ে প্রতিপক্ষকে রুচিশীল কিন্তু তির্যক ভাষায় বক্তব্য দিয়ে মোকাবেলা করতে। এটি সম্ভব হয় দলের প্রধান থেকে শুরু করে সর্বস্তরের নেতাকর্মীর মাঝে সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালনের কারণে।

সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য শুধু মাত্র পরিবেশই যে সহায়ক তা কিন্তু নয় বরং এর সাথে শিক্ষার বিষয়টিও গভীরভাবে জড়িত। সুশিক্ষিত একটি পরিবারের সন্তানদের সাথে অশিক্ষিত পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করলে দেখা যায় স্বল্প শিক্ষিতরা যতই সম্পদশালী হোক না কেন তারা উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সন্তানদের চেয়ে সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে ওঠেন না। তাদের মাঝে আচরণের পার্থক্য অনেক। তবে শিক্ষিতদের মাঝেও কিছু অথর্ব বা জ্ঞানপাপী থাকেন যারা শিক্ষার পুঁজিকে ঢাল বানিয়ে বড়াই করেন। তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বল্প শিক্ষিতের নীচুতাকেও হার মানায়। সত্যিকারার্থে তারা জীবনকে বদলাতে পারেন না।

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি যখন পরিবেশ, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা পুঁজি করে সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন তখন তার প্রয়োজন হয় আত্মপ্রচেষ্টা। কারণ যতই পরিবেশ সুন্দর হোক না কেন, ব্যক্তির জ্ঞান-গরিমা যতই থাকুক না কেন, অভিজ্ঞতার ঝুলি যত বেশিই হোক না কেন, ব্যক্তি যদি নিজকে পরিবর্তন করার মতো দৃষ্টিভঙ্গি লালন না করেন তাহলে এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত থাকে না। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না। এ ধরনের প্রচেষ্টা জীবনকে বদলাতে পারে না। জীবনকে বদলাতে প্রয়োজন আত্মপ্রচেষ্টামূলক দৃষ্টিভঙ্গি যা নিজেকে দিয়েই শুরু করতে হয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা রা'দের ১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্যের (অবস্থার) পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা না করে" 'বদলে যাও' বদলে দাও, এটি নতুন কোনো শ্লোগান নয়। বরং সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অভাবেই এটা ধামাচাপা পড়েছিল। যারা মনে করেন ইসলাম সেকেলে ধর্ম, ইসলামে কোন আধুনিকতা নেই এটি তাদেরই কারসাজি। অথচ ইসলাম যে কত আধুনিক তার প্রমাণ হচ্ছে বদলে যাওয়ার জন্য আগে নিজেকে দিয়ে বদলানোর অভিযান শুরু করার তাগিদ ইসলাম প্রায় সাড়ে ১৪ শ' বছর আগেই নবী মুহাম্মদ সা.-এর ওপর নাজিলকৃত মহাসত্য গ্রন্থ আল কুরআনের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সুতরাং এই মহাসত্যকে ধারণ করে সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে পারলেই জীবনটাকে বদলে দেয়া সম্ভব। একজন মহা মনীষী বলেছেন, সুসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জীবনে পবিত্র অনুভূতি সৃষ্টি করে আর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণতার সুযোগকে নষ্ট করে দেয়। আমাদের প্রতিটি অনুভূতিই হোক পূর্ণতার, দৃষ্টিভঙ্গি হোক ইতিবাচক আর সুসম্পন্ন। বদলে যাক জীবন, পূরণ হোক লালিত স্বপ্নের।

www.nagorikpathagar.org

সময়ানুবর্তিতা

১. সময় হারিয়ে যাচ্ছে সময়েরই অন্ধকারে

সময় সম্পর্কে প্রাথমিক কিংবা সার্বজনীন ধারণা হচ্ছে সময় শুধুমাত্র সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস এবং বছরের মাপকাঠির নাম। সময়ের কথা ভাবতে আমরা সকলেই ঘড়ি বা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাই। অথচ এটি সময়ের ব্যাপ্তির একটি রূপ মাত্র। এটি সময় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অগভীর বা হালকা ধারণা। সময় সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণা হচ্ছে সময় একটি সুযোগের নাম। এই সুযোগ সকল সময়ের জন্য স্থায়ী থাকে না। যখন সময় তার সর্বোচ্চ মানে অবস্থান করে তখনই সে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব বহন করে থাকে। যারা সময়ের এই গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন তারা জীবনের সমস্যাবলিকে অনেকাংশে সহজীকরণ করে নেন, ফলশ্রুতিতে তারা সাফল্যের দেখা পান। সময়কে শুধুমাত্র যদি সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস এবং বছরের ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলি তাহলে এরূপ ধারণা দ্বারা কখনোই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। বরং সময়কে সময়ের ব্যাপ্তি হিসেবে ধারণ করার পাশাপাশি এটিকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

পৃথিবীতে সময় এমন একটি বিষয়ের নাম যা সবচেয়ে বেশি দীর্ঘস্থায়ী, পক্ষান্তরে এটি সবচেয়ে বেশি ক্ষণস্থায়ীও বটে, কেননা আমাদের জীবনের সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় প্রদত্ত সময় নিতান্তই অল্প। এটি সবচেয়ে বেশি দ্রুতগামী আবার যদিও তা সবচেয়ে বেশি শ্লথ। এটি দ্রুতগামী তাদের কাছে, যারা সুখের সাগরে ভাসছে। আর পক্ষান্তরে মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়ে যে সময়

www.nagorikpathagar.org

শুনছে তার দৃষ্টিতে তো ২/৩ মিনিট সময়ও অবশ্যই শ্লথ-ই হবে। আমরা সকলেই একে অবজ্ঞা করি যদিও পরে সকলেই আবার অনুশোচনা করি। সময়কে তো আমরা অবজ্ঞা করিই। তা না হলে জীবন থেকে দু-একটি ঘণ্টা সময়কেও অযথা পার হতে দিতাম না। কিন্তু আবার এই অন্যায় অবহেলাই আমাদেরকে পীড়া দিয়ে থাকে কখনও কখনও। সে কারণেই তো মূল্যবান কোনো পরীক্ষার সময় প্রতিবারই ছাত্র-ছাত্রীরা অনুশোচনা করে থাকে তাদের বিগত দিনের সময় অপচয়ের জন্য। পরে অনুশোচনার কথা ভুলে গিয়ে আবার সেই অপচয়ের পথই ধরে।

আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। আর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের নির্দিষ্ট একটা সময় বেঁধে দেয়া আছে। জীবনের বেঁধে দেয়া এ সামান্য সময়টুকুন নানাভাবে কাটিয়ে দেয়া যায়। হাসি, গল্প, আনন্দ, আড্ডা, খেল-তামাশা, আলাপ-আলোচনা করে অফুরন্ত আনন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু যিনি ব্যক্তিজীবনকে সার্থক করে তুলতে চান, সাফল্যকে হাতের মুঠোয় নিতে চান, যিনি চান বিজয় ছিনিয়ে আনতে তার পক্ষে সামান্য মনে করে এ সময়টুকু হেলায় কাটিয়ে দেয়া মোটেই ঠিক নয়। সাফল্যের পেছনে যারা ছুটে বেড়ান তারা সময়ের মূল্য বুঝে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি সেকেন্ডকে কাজে লাগিয়ে সাফল্য নিজের করে নেন। যারা সময়ের মূল্য বোঝে এর মর্যাদা দিতে জানে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বিজয় তাদের হবেই। সাফল্য অর্জন করতে চাইলে সবার আগে সময়ের মূল্য বুঝতে হবে, এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। ঊনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স বলেছিলেন, "বড় হতে হলে সর্বপ্রথম সময়ের মূল্য দিতে হবে" শেক্সপিয়র একটি কথা বলেছিলেন, **"I wasted time and now doth time waste me."** অর্থাৎ আমি সময় নষ্ট করেছি আর সময় এখন আমাকে নষ্ট করছে।

কর্মের তুলনায় সময়ের পরিধি খুবই কম। সুতরাং সময় নষ্ট করা মানে জীবনকেই ধ্বংস করা। প্রতিটি সেকেন্ডকে সমান গুরুত্ব দিয়ে যদি কাজের পেছনে লেগে থাকা যায় তাহলে কয়েক মিনিট কিংবা ঘণ্টা শেষে হিসেব কষলে দেখা যাবে একটি বড় ভালো কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সাফল্য প্রতিটি সেকেন্ডের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। সেকেন্ডে সামান্য সময় তাই বলে তাকে অবহেলা করা কিংবা গুরুত্ব কম দেয়ার সুযোগ নেই। কখনো কখনো মাথায় এ ভাবনার উদয় হয় যে, এ কাজটি যদি এখন না করি তাহলে তাতে এমন কি আর আসে যায়? সামনে আরো অনেক সময় আছে। কিন্তু একটি বারের জন্যও এ ধারণা হয় না যে, এখন আর ভবিষ্যতের সময় দু'টি তো এক নয়। দু'টিই তো নিজ নিজ স্থানে অতি মূল্যবান। যে সময়টুকু চলে গেল তা তো কখনো ফিরে আসবে না। যদি তা বিনষ্ট

www.nagorikpathagar.org

হয়ে থাকে তবে তা হাতছাড়া হয়ে গেল। শত ক্রন্দনেও এরপর তা আর ফিরে আসবে না। একটি প্রসিদ্ধ ফার্সি উক্তি আছে– 'যদি একটি মুহূর্ত উদাসীন থাকি, তবে হাজার মাস পেছনে পড়ে যাব।' এটি একটি বাস্তব সত্য যে, কখনো কখনো মানুষ মুহূর্তের ভুলের কারণে শত বছর পিছিয়ে পড়ে। প্রকৃত বুদ্ধিমান তো সে-ই, যে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পূর্ণ দৃঢ়তা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ভবিষ্যতের পথে চলে। এক-একটি মুহূর্ত হিসেব করে খরচ করে আর সময়কে অধিক থেকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে সচেষ্ট হয়। পৃথিবীতে এমন কি কোনো কাজ আছে যা করা যায় সময়ের ব্যবহার ছাড়া? একে ছাড়া কিছুই করা যায় না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবকিছুকে এটা গ্রাস করে নেয়, অথচ যা কিছু মহৎ এবং বড় তা সে তৈরি করে।

সাধারণত কাণ্ডজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা জানেন সময় কত বেশি মূল্যবান। একটি প্রবাদ আছে 'সময় হলো সোনার মতো দামি।' অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করেন। সময়ের ব্যাপারে সচেতন হতে আমাদের মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, এই পৃথিবীর জীবন অস্থায়ী ছাড়া কিছু নয়। আমরা জানি না কখন আমাদের সময় শেষ হয়ে মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রয়েছে। জীবনের শেষ সময় কখন তা যেহেতু আমরা কেউ জানি না সেহেতু আমাদের অবশ্যই সময়কে গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক দিকনির্দেশনা ও সাফল্যের প্রয়োজনেই আমরা কখনো সময়ের অপচয় বা অপব্যবহার করতে পারি না। হজরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "মানুষের জন্য দু'টি আশীর্বাদ রয়েছে, যা অনেকেই হারিয়ে ফেলে। এগুলো হলো ভালো কাজের জন্য স্বাস্থ্য ও সময়" (বোখারি)। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "কালের কসম, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে, তারা ছাড়া যারা ঈমানদার, সৎকর্মশীল, পরস্পরকে সত্যনিষ্ঠার নির্দেশ প্রদানকারী এবং ধৈর্যধারণকারী ও অবিচল" (সূরা আসর: ১-৩)। মহান আল্লাহ তায়ালা এ সূরার শুরুতেই সময়ের শপথ নিয়ে বলেছেন, কারা ক্ষতিগ্রস্ত আর কারা নয়। সুতরাং সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই যারা কাজ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে, তারাই সফলকাম হবে।

সফল হতে হলে প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিন, প্রতিটি সময়কে আমরা যেন প্রজ্ঞার সাথে কাজে লাগাই। একটা দিন মানে ২৪ ঘণ্টা বা ১৪৪০ মিনিট বা ৮৬৪০০ সেকেন্ড। প্রতিদিন এই সময়টুকু আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা। আমরা চাইলেই এর কম বেশি করা সম্ভব নয়। আমি চাইলে সব কিছু কমাতে বা বাড়াতে পারি কিন্তু চাইলেই কি সময়কে কমাতে বা বাড়াতে পারি? কখনোই না। অনেককে পাওয়া যাবে যারা সারাদিনই কাজ করছেন অথচ কাজ শেষ করতে পারছেন না।

www.nagorikpathagar.org

তারা ভাবেন যদি দিনটির পরিধি ৪৮ ঘণ্টা হতো অথবা ঘণ্টাটা ৬০ মিনিটের স্থলে ১০০ মিনিট করে হতো। প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই তারা কাজের চাপে ন্যুব্জ হয়ে পড়েন। সমাজে এমনও কেউ আছেন যারা সময়কে কাজে লাগাতে পারেন না। তারা সময় নষ্ট করে থাকেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে। এরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সময় নষ্ট করেন ঘুমিয়ে, আড্ডা দিয়ে আর অবহেলায়। ঘুমের ব্যাপারে বর্তমানে কোথায়ও কোথায়ও একটা নিয়ম প্রচলিত হয়ে পড়েছে প্রায়। তা হলো সকালে ফজরের নামাজের পরে দ্বিতীয় বার ঘুম এবং দুপুরে খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার নাম দিয়ে তৃতীয়বার ঘুম। তাদের অনেকেই ভেবে থাকেন সময় তাদের নিজস্ব সম্পদ (**personal property**)। প্রকৃতপক্ষে সময় আমাদের নিজেদের নয়। সময় সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। কারণ সময়ইতো গিলে খেয়েছে অতীতের কত বিশাল সংখ্যক মানবগোষ্ঠীকে। বিগত হয়েছে তারা সকলে খালি হাতে। ইতিহাস তাদেরকে গ্রহণ করেনি সঙ্গত কারণেই। করেছে মাত্র অল্প কিছু মহামানবকে। ব্যর্থ লোকেরা যা করতে অনিচ্ছুক সফল লোকেরা তা করে তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করে। সফলতার জন্যে প্রয়োজনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষার সাথে খাপ খাইয়ে সময় ব্যয় করার চেয়ে ব্যর্থতার গ্লানির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়াকে সাধারণ ব্যক্তিরা সহজতর মনে করে। যারা এরূপ মনে করে তারা সফলতার পরিবর্তে ব্যর্থতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়।

কিছু মানুষ এমন আছেন যাকে আজ একটি কাজ দিলে কাল করব বলে যদি রেখে দেন, আর এই কাজটিই যদি তাকে আগামীকাল দেয়া হয় তবে তা পরবর্তী দিনের জন্যই রেখে দেন। মূলত এভাবেই আমরা সময়ক্ষেপণ করে থাকি, আর সেই সাথে সময় নামক সুযোগকে হাতছাড়া করি। শেষ পর্যন্ত এভাবেই আমরা ভাগ্যের বিড়ম্বনার শিকার হই। অপর দিকে যারা আগামী কালের জন্য বসে থাকেন না কখনও, আজকের দিনটুকুকেই যারা কাজে লাগাতে উদগ্রীব থাকেন, তারাইতো সময়কে কাজে লাগাতে পারেন পরিপূর্ণভাবে। তাইতো জগতে বিস্ময়কর কিছু করার এখতিয়ার শুধুমাত্র তাদেরই। প্রতিদিন সকালে যখন আমরা ঘুম থেকে উঠি তখন আমাদের আসন্ন দিনটির জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ থাকে। যে প্রতিদিনের ২৪টি ঘণ্টা সুচারুরূপে কাজে লাগাতে পারে সেই শেষ হাসি হাসতে পারে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তিনিই সাফল্য অর্জন করেন। কারণ এই সময়তো আর কখনো ফিরে আসবে না। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, দু'জন ফেরেশতার নিম্নরূপ আহবান ব্যতীত একটি প্রভাতও আসে না– "হে আদম সন্তান! আমি একটি নতুন দিন এবং আমি তোমার কাজের সাক্ষী! সুতরাং আমার সর্বোত্তম ব্যবহার কর। শেষ বিচার দিনের আগে আমি আর কখনও ফিরে আসব না" মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল (সা)-এর উপর্যুক্ত

www.nagorikpathagar.org

বাণীতে সময়ের পক্ষ হতে একটি উদাত্ত আহবান রয়েছে, আমার সর্বোত্তম ব্যবহার কর। আর পাশাপাশি রয়েছে এক ধরনের সতর্কীকরণ। আজকের দিনের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে শেষ বিচারের দিন। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার আগেই সময়ের ব্যবহারের ব্যাপারে সংযত হতে হবে আমাদেরকে– এটা একটা কঠিন সতর্কীকরণই বটে।

আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না। যদি আপনি কাজ শুরু করতে বিলম্ব করেন, তবে কাজ স্তূপীকৃত হতে থাকবে। কাল কি হবে তা আপনি জানেন না। গতকালের অসমাপ্ত কোনো কাজ নেই, এমন অবস্থায় যদি আপনি দিন শুরু করতে পারেন, তবে তা হবে এক বড় স্বস্তি। আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখলে আপনি কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে ঝুঁকিতে পড়ে যাবেন। আজকের কাজ আজই সম্পন্ন করতে পারলেন না তাহলে আগামীকাল কিভাবে ফেলে রাখা কাজসহ দিনের নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করবেন? সুতরাং আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না। বরং আজকের কাজ শেষ করে আগামী কালের ব্যাপারে চিন্তা করুন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তায়ালা সে সম্পর্কে খবর রাখেন” (সূরা হাশর-১৮)। মহান রাব্বুল আলামিন সময়ের ব্যবহারের ব্যাপারে আমাদের হিসাব নেবেন হাশরের দিন। আর সেদিন মানুষের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ব্যক্ত হয়েছে, “প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন” (সূরা মুনাফিক ১১)। মহান আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে আরো বলেন, “সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব বের করুন আমাদেরকে। আমরা সৎকাজ করব। পূর্বে যা করতাম তা করব না, তা করব না। (আল্লাহ্ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতোটা সময় দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার সে বিষয়ে চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নাই” (সূরা ফাতির ৩৭)।

সময় সম্পর্কে কিছু প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কথা আছে যেগুলোর অনেকগুলোর সাথেই আমরা পরিচিত। যেমন– সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়, সময় আর বহমান স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না, সময় নেবেন চিন্তা করতে, এটি সাফল্যের উৎস। সময় নেবেন পড়তে, এটি জ্ঞানের ভিত্তি। সময় নেবেন নামাজ

www.nagorikpathagar.org

আদায় করতে, এটি দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় শান্তি। সময় নেবেন বন্ধু বনে যেতে, এটি সুখের সোপান। সময় নেবেন হাসতে, এটি সর্বোত্তম লুব্রিক্যান্ট। সময় নেবেন দিতে বা দান করতে, স্বার্থপর হয়ে জীবনটাকে ছোট করার কোনো অর্থ নেই। আপনার সময়ক্ষেপণ করতে পারে এমন চিন্তাশূন্য লোক এড়িয়ে চলবেন। তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবেন যেন লোকটি আবার আপনার আচরণে কষ্ট না পায়। মনে রাখবেন, সময় নেবেন কাজ করতে কারণ এটি সফলতার মূল্য (**price**), কিন্তু সময়ক্ষেপণের জন্য কখনও সময় নেবেন না। সময় সম্পর্কে এ সকল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কথা আমাদের জানা থাকলেও আমরা অনেকেই তা থেকে শিক্ষা নিই না। বরং আমাদের প্রতিটা দিনই একই রকম যায়, জীবনে আসে না কোনো সাফল্য, হয় না কোনো পরিবর্তন। স্মরণ রাখবেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "যার দু'টি দিন একই রকম যায় নিঃসন্দেহে সে ক্ষতিগ্রস্ত"

আমাদের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে সময়। সময়ের ওপর ভর করেই জীবনের উন্নতি ত্বরান্বিত হয় এবং সময়কে যথাযথ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে জীবনের অবনতি হয়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে **Time is all the best of money.** অর্থাৎ সময়-ই হচ্ছে সব সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানবজীবনের সীমাবদ্ধ গণ্ডিকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সময় একমাত্র উপজীব্য। সময় জ্ঞান না থাকলে জীবনে কখনও উন্নতির আশা পূরণ হয় না। পক্ষান্তরে সময়ই মানব জীবনের উন্নতি, সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপাদেয়। জীবনের গতি সময়ের গতির মতোই নির্মম। কারণ জীবন বয়স তথা সময়ের ফ্রেমে বাঁধা। তাই জীবনের কোনো মূল্য নেই সময় ছাড়া। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সময়টুকু থাকে, তাকে যিনি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন, প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন, কেবল তার জীবনই মূল্যবান। এবার নিজেরাই একটু ভাবুন কী করছেন। নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারছেন না তো? সময় হারিয়ে যাচ্ছে সময়েরই অন্ধকারে। সমাধান কী? সমাধান আপনার হাতের কাছেই, সময়ের গুরুত্ব দিন, সময় নামক সুযোগটাকে কাজে লাগান।

২. সাফল্য অর্জনে প্রয়োজন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব হিসেবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ মৌলিক সকল কাজই প্রাত্যহিক জীবনে মানুষকে করতে হয়। মৌলিক কাজের পাশাপাশি চাহিদা পূরণে মানুষকে ছোট থেকে বড় অনেক কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়। ছোট কিংবা বড় হোক অনেক কাজ একদিনেই করা হয় না।

www.nagorikpathagar.org

আবার কোন কাজ প্রতিদিনই করা হয় না। দৈনন্দিন জীবনে কয়টি কাজ করবেন তা নির্ভর করবে কয়টি কাজ করা সম্ভব তার ওপর। মানুষের জীবনে ব্যস্ততা চিরন্তন। অবসর সময়ে চুপ করে বসে থাকাও সময়ের বিচারে একটি ব্যস্ততা। কিন্তু এই নির্দিষ্ট সময়ের জীবনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সবসময় কাজ করাই হলো ব্যক্তিজীবনের মূল সফলতা। যদি প্রশ্ন করা হয়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা বিষয়টি ব্যক্তিজীবনের সফলতার সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত। উত্তর একটাই, নির্দিষ্ট সময়ে অসীম চাহিদা পূরণ করতে হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজের কোন বিকল্প নেই। আমাদের মাঝে অনেককেই পাওয়া যাবে সময় নির্দিষ্ট অর্থাৎ দিনে ২৪ ঘণ্টা এটি জানার পরও সারাদিন কাজ করছেন অথচ কাজ শেষ করতে পারছেন না। তারা আকাঙ্ক্ষা করেন, ইস! ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তে যদি দিনটি আরো কয়েক ঘণ্টা বেশি হতো।

যারা কাজ করেন না অলস সময় কাটান তাদের জন্য হিসাবটা ভিন্ন। কিন্তু যারা কাজের সফলতা চান, যারা চান নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে। যারা প্রতিদিনই বিরামহীন কাজ করতে করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজে সফলতা চান তাদের যথাসময়ে কাজে অসফল হওয়ার বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তারা গুছিয়ে কাজ করেননি। অর্থাৎ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করেননি। সময় যে বছর মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘন্টা, সেকেন্ডের মাপকাঠি তা অনেকেই ভুলে যান। অনেকেই ভুলে যান দিন ২৪ ঘণ্টার বেশি হওয়া সম্ভব নয় কিংবা মিনিটও ৬০ সেকেন্ডের বেশি হওয়া সম্ভব নয়। সেকেন্ড মিনিট ঘণ্টার এই সময়গুলো সুনির্দি” কালের বিচারে আগামীকাল বলতে কোনো শব্দ বাস্তবিকই সময়ের খাতায় অর্থহীন। কারণ আগামীকাল বলে আপনি যে সময়কে চিন্তা করছেন সে সময়ের মুখোমুখি যখন আপনি হবেন তখন সেই সময়টিই আপনার নিকট আগামীকালের পরিবর্তে বর্তমান তথা আজে পরিণত হবে। আগামীকাল বলতে কোন দিন নেই। দিন নামক শব্দটি শুধু আজকের জন্য- তাই আজকের সর্বোত্তম ব্যবহার করা প্রয়োজন। আর সর্বোত্তম ব্যবহারের নিশ্চয়তা দেবে দৈনন্দিন কাজগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিন্যাস করা। কাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি তালিকা তৈরি করে চিন্তা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারলে তবেই ধরা দেবে সফলতা।

ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকের কাজেরই ভিন্ন ভিন্ন ধরন রয়েছে। কিন্তু চাহিদা সবারই সমান। যেমন নামাজ, অজু, গোসল, দাঁত ব্রাশ, নাস্তা, ঘুম, এগুলো সকলেরই মৌলিক কাজ। কিন্তু এর বাইরেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছু নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির তাই অগ্রাধিকারের তালিকাও হবে ভিন্ন ভিন্ন। একজন ছাত্রের

www.nagorikpathagar.org

অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা যখন সামনে আসবে তখন তার অগ্রাধিকারের তালিকায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে পড়া, পড়া এবং পড়া। আবার এই পড়ার ক্ষেত্রেও আরেকটি বিষয় অগ্রাধিকার পাবে তা হলো, কোন বিষয়ে কতটুকু পড়া হবে। কোন সময় কোন বিষয় পড়া হবে। প্রতিদিন সময় যেহেতু নির্দিষ্ট অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার। এই ২৪ ঘণ্টার ভেতরেই কাজ সম্পাদনের জন্য একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা থাকবে। তালিকার ক্ষেত্রে যদি ধরা যাক একজন ছাত্রকে প্রতিদিন ১০টি বিষয়ের পড়া তৈরি করতে হবে তাহলে তাকে কোন বিষয় কতটুকু সময় দিয়ে পড়তে হবে তা আগে ঠিক করে নিতে হবে। ১০টি বিষয় একজন ছাত্র সমান পারদর্শী না-ও হতে পারে। 'ইংরেজি'তে দুর্বল হলে তার জন্য সময় একটু বেশিই বরাদ্দ থাকতে হবে। আবার 'বাংলা'য় ভালো হলে একটু কম সময় বরাদ্দ রাখতে হবে।

এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সফলতার জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক প্ল্যান তৈরি করে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। যিনি ব্যবসায়ী তারও একটা অগ্রাধিকারভিত্তিক প্ল্যান থাকতে হবে, তার প্ল্যানে ব্যবসায়িক খুঁটিনাটি বিষয়টিই হবে তার অগ্রাধিকারের বিষয়। একজন ব্যবসায়ী যদি তার দোকানে বিক্রির জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন না করে পণ্য মজুদ করেন তাহলে যে চিত্রটি দেখা যাবে তা ব্যবসাবান্ধব চিত্র নয়। যেমন একটি মুদির দোকানে যদি ক্রেতার সর্বাধিক চাহিদা থাকে আটা, ময়দা, সুজির। এই তিনটি পণ্য দোকানে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। এখন ঐ বিক্রেতা যদি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পণ্য মজুদ না করে লবণ চিনি বেশি মজুদ করেন তাহলে অর্থকরী সম্পদ হওয়ার পরও তার এই সম্পদ ব্যবসা সমৃদ্ধিতে বেশি কাজে লাগবে না। বরং তাকে আটা ময়দা সুজিই বেশি মজুদ রাখতে হবে। কারণ ক্রেতা আটা ময়দা সুজি ক্রয়ের জন্যই বেশি আসবে। তেমনিভাবে একজন ছাত্রকে জ্ঞান আহরণের জন্য, ক্লাসের পড়া তৈরি করার জন্য, দুর্বল সাবজেক্ট হিসেবে ইংরেজি, গণিতে বেশি সময় দিতে হবে। কিন্তু সে যদি পারদর্শী হওয়ার পরও বাংলায়ই বেশি সময় দেয় তাহলে বিষয়টি হবে আটা ময়দা সুজিতে বিনিয়োগ বেশি না করার মতো। লবণ চিনির মতো বাংলায়ও জ্ঞান অর্জন হবে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মেধা অর্জনে ইংরেজি গণিতের চাহিদা পূরণ করতে না পারার কারণে কাঙ্ক্ষিত ভালো রেজাল্ট আসবে না।

আবার যিনি সংগঠক, সমাজসংস্কারক তার অগ্রাধিকারে সংগঠন পরিচালনার মূল বিষয়টিই প্রাধান্য পাবে। ছাত্রজীবনে যিনি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন অথবা যিনি সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার চর্চা করেন, তাকেও অগ্রাধিকারভিত্তিক একটি প্ল্যান প্রতিদিনই তৈরি করতে হবে। তবে তার ব্যস্ততা

www.nagorikpathagar.org

প্রতিদিনের মত সমান না-ও হতে পারে। এ জন্য সার্বিক ভারসাম্যের জন্য তাকে কিছু সময় টেবিল ওয়ার্ক করা উচিত। অর্থাৎ প্রতিদিন কয়েক মিনিট সময় টেবিলে বসে দিনের সুনির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা নেয়া উচিত। যাতে তিনি প্রণয়ন করবেন কোন সময় কোন কাজ করবেন, কোন কাজকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখবেন। তার পাশাপাশি অধ্যয়নের সময় কোনভাবেই এ পরিকল্পনা থেকে বাদ যাবে না এই হিসাবটাও করে রাখতে হবে। যেদিন সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা সেদিনও কয়েক ঘণ্টা অধ্যয়নের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সেরা মেধাবী ছাত্র শহীদ আবদুল মালেকের পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক নীতি ছিল, তিনি যত বেশি ব্যস্ততার মাঝেই দিন অতিবাহিত করেন না কেন অন্তত কম করে হলেও দু-ঘণ্টা পড়াশোনা করে তারপরই ঘুমোতে যেতেন।

একজন ছাত্রের মূল স্লোগান হলো 'ছাত্র নং অধ্যায় নং তপঃ' পড়াশোনাই হবে তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এক্ষেত্রে সফল তারাই যারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে পারেন যারা বিচক্ষণতার সাথে প্রাত্যহিক কাজের প্ল্যান তৈরি করতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্ল্যানটি কাগজে কলমে লিখিত থাকা উচিত, চাই সেটা ছোট এক টুকরা চিরকুট হোক না কেন। যারা কাগজে কলমে না লিখে মুখস্থ প্ল্যান নেয়ায় অভ্যস্ত তাদেরই গুরুত্বপূর্ণ কাজ অথবা দু-একটি অগ্রাধিকারের কাজ খেয়ালের ভুলে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারার আশঙ্কা বেশি থাকে। মানব জীবনের জন্য সময় সুনির্দি" সুনির্দিষ্ট সময় টুকুকে অগ্রাধিকারভিত্তিক প্ল্যানের আওতায় নিয়ে এসে কাজের সাথে খাপ খাওয়ানো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক কাজ হাতে আসবে তার মধ্যে কোন কাজটি সবার আগে সম্পন্ন করতে হবে তা নির্ধারণ করে কাজ শুরু করতে পারাই যথার্থতা। আর আজকের কাজ আজকের মধ্যেই সম্পন্ন করাই সার্থকতা। কাউকে একটি কাজ দিলে কাল করবো বলে যদি রেখে দেয় দেখা যাবে আগামী কাল অন্য ব্যস্ততায় এই কাজটিই পরবর্তী দিনের জন্য রক্ষিত হয়ে যাবে। এভাবেই মানুষ সুযোগ হাতছাড়া করে, সময় ক্ষেপণ করে সুযোগকে নষ্ট করে, সম্ভাবনাকে হাতছাড়া করে, আর এভাবেই শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের নির্মম বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়।

অপর দিকে যাদের মধ্যে সময়ের জ্ঞান আছে, সময়ের কাজ সময়ে করার প্রতিজ্ঞা আছে, অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজের প্ল্যান আছে, আজকের কাজ আজকেই সমাধান করার উদগ্রীব ব্যাকুলতা আছে, তারাই তো জীবনে প্রকৃত সফলকাম হন। তারা কখনো আগামীকালের জন্য বসে থাকেন না বলেই বিজয়ীর হাসি তারাই হাসেন। প্রকৃতপক্ষে সময় হচ্ছে একটি সুযোগ মাত্র। এই সুযোগ সকল সময় আসে না,

www.nagorikpathagar.org

আসলেও স্থায়ী থাকে না। কারণ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দ্রুতগামী বিষয় হচ্ছে সময়। যারা সময়ের গুরুত্ব বুঝে জীবনের কাজগুলোকে অগ্রাধিকার প্ল্যানের মধ্যে নিয়ে এসে সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন তারা সফলতার জন্য জীবনের সকল বিষয় এমনকি জটিল বিষয়গুলোকেই সহজ করে নেন। আর এর ফলে সফলতা তাদের হাতের মুঠোয় সহজেই ধরা দেয়। সময় হচ্ছে মূল্যবান সুযোগ। আর তা শেষ হওয়ার পর মানুষের সামনে আর কোন অবকাশ থাকে না। সময়ের ব্যাপারে সার্বজনীন মূলনীতি হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের জন্য সমপরিমাণ ঘণ্টা ও মিনিট বরাদ্দ রয়েছে। এই ঘণ্টা ও মিনিটগুলোকে আপনি জমা করে রাখতে পারবেন না আবার কারো সাথে বিনিময়ও করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন" (সূরা মুনাফিকুন-১১)। নির্দিষ্ট সময় চলে যাওয়ার পর আর অবকাশ পাওয়া যায় না। পরীক্ষার আগে প্রস্তুতির যে সময় পাওয়া যায় সেটি যখন শেষ হয় পরীক্ষা সমাগত হয় তখন ইচ্ছা করলেও আগের সময় ফিরে পাওয়ার কোন অবকাশ নেই। দুনিয়ার জীবনে হয়তো আন্দোলন বিক্ষোভ করে পরীক্ষা পেছানো যেতে পারে কিন্তু পরকালীন জীবনে মানুষ আর্তচিৎকার করেও সময়ের অবকাশ পাবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, "সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব বের করুন আমাদেরকে। আমরা সৎ কাজ করব। আগে যা খারাপ কাজ করতাম তা আর করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দিইনি যাতে যা চিন্তা করার সে বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই" (সূরা ফাতির-৩৭)। সত্যিকার অর্থে তারাই সময় সম্পর্কে উদাসীন, যারা অবচেতন মনে সময় নষ্ট করেন। তারা জীবনে সফলতার মুখ দেখেন না। সম্মুখীন হন চরম ক্ষতির। সময় নষ্ট করা মানেই জীবনকে ক্ষতির সম্মুখীন করে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে দেয়া। মহান আল্লাহ্ সূরা আসরের মধ্যে এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন, "সময়ের কসম নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়" সুতরাং সময়ের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে আমাদেরকে সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে হবে। সময় ও কাজকে ভাগ করে নেয়া যায় এভাবে– ১. অবশ্যই করণীয় ২. করণীয় ৩. করা দরকার ৪. সময় থাকলে করা ভালো। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ না করলে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ জন্য সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা।

www.nagorikpathagar.org

৩. সাফল্য অর্জনের অন্যতম চাবিকাঠি ধৈর্য

সাফল্যের চূড়ায় উত্তীর্ণ হতে মানুষ নানা ধরনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। অনেক কষ্টে, ঘামে শ্রমে পরিশ্রমে সেই সাফল্যকে নিজের করে নেয়। নিজের অর্জিত সাফল্যের পথপরিক্রমা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাতে ধৈর্যের রয়েছে বিশাল অবদান। কাজের ক্ষেত্রে কেউ যদি ধৈর্যশীল হয় তাহলে তার সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা থাকে শতভাগ। ধৈর্য হারালে ফল হয় তার বিপরীত। সমাজে এমনও মানুষ আছেন যারা ধৈর্যধারণের অভাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের সিঁড়িতেই আরোহণ করতে পারেন না। আবার কেউ এমনও আছেন যারা সাফল্যের চূড়ায় গিয়েও সামান্য ধৈর্যের অভাবে হোঁচট খেয়ে সাফল্য হাতছাড়া করে ফেলেন। তাই এটি অনস্বীকার্য সত্য যে ধৈর্য সাফল্য লাভের অন্যতম চাবিকাঠি। সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি হওয়ায় ধৈর্যের প্রতিযোগিতায়ও আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। মহান আল্লাহ্ বিজ্ঞানময় কুরআনে এ ব্যাপারে বলেন, "হে ঈমানদারগণ (বিশ্বাসীগণ)! তোমরা সবর কর এবং সবরের প্রতিযোগিতা কর" (সূরা আলে ইমরান-২০০)।

মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই একেকটি পরীক্ষাক্ষেত্র। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই মানুষকে পথ চলতে হয়। মানুষের এই পথচলায় ধৈর্য একজন সাহসী সঙ্গীর মতো। পরীক্ষার চরম মুহূর্তে পরম বন্ধুর মতো যিনি ধৈর্যকে সত্যিকারের সঙ্গী বানাতে পারেন সাফল্য তিনিই ছিনিয়ে আনতে পারেন। আর যিনি ধৈর্য নামক সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলেন তিনি সাফল্য অর্জন তো দূরের কথা সাফল্যের দেখাও পান না। প্রতিনিয়ত পরীক্ষার সম্মুখীন মানুষদের মধ্যে শুধু ধৈর্যশীলদের জন্যই রয়েছে সাফল্য লাভের সুসংবাদ। এ ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, "অবশ্যই তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করব। আর তোমাদের জান, মাল ও শস্যের ক্ষতি সাধন করেও পরীক্ষা করব আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও" (সূরা বাকারা-১৫৫)। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, "বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে, তার প্রতিদানও তত মূল্যবান। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন" (তিরমিযি)।

সাফল্য অর্জনের জন্য সকল কাজেই ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন। কাজ শুরু করে ধৈর্যসহকারে এগোতে থাকলে ফল আসবেই। সামান্য ধৈর্যচ্যুতিই বিপর্যয় ঘটাতে

www.nagorikpathagar.org

পারে সাফল্যে। ধৈর্য ধারণ করে কাজ করলে সেই কাজের ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। কারণ মহান আল্লাহ্ তায়ালা সূরা হুদের ১১৫ নম্বর আয়াতে বলেন, "সবর অবলম্বন কর। আল্লাহ্ মুহসিনদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না" ধৈর্যশীলরা যেমন সাফল্য লাভ করেন তেমনি তারা বেশি লোকের ওপর বিজয়ী হন। সূরা আনফালের ৬৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– "তোমাদের মধ্যে যদি ২০ জন ধৈর্যশীল থাকে তবে ২০০ জনের ওপর বিজয়ী হবে"

ধৈর্য ধারণ করে ধীরে ধীরে নিজেকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়োর কোনো সুযোগ নেই। যেকোনো কাজেই তাড়াহুড়ো সমস্যার কারণ হতে বাধ্য। কারণ কোনো বিষয়ে রাতারাতি কিংবা এক-দু'দিনেই সাফল্যের শিখরে পৌছা যাবে এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আবার মাসের পর মাস চলে গেছে টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না ভেবে কাজ ছেড়ে পালানোতেও কোনো কল্যাণ নেই। তাড়াহুড়োয় যেমন সাফল্য অর্জিত হয় না তেমনি ধৈর্যচ্যুতিতেও সাফল্য ধরা দেয় না। বরং সামনের সময়টুকু কিংবা সামনের দিনগুলোতেই সাফল্যের দেখা মিলবে এরূপ চিন্তা করে ধৈর্য নিয়ে কাজ করে যেতে পারলে ফলাফল আসবেই। হজরত আলী (রা) বলেন, সব বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা এক ধরনের পাগলামি। সাধারণত এ ধরনের লোক পদে পদে লাঞ্ছিত হয়।

ধৈর্য একটি মহৎ গুণ। হজরত আবু বকর (রা) ধৈর্যকে অপরিসীম পুণ্য হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "সব পুণ্যেরই একটা সীমা আছে, কিন্তু ধৈর্য এমন একটা পুণ্য, যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই" প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) ইসলামী আন্দোলনঃ সাফল্যের শর্তাবলি বইয়ে ধৈর্যকে পূর্ণতাদানকারী একটি গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ধৈর্যের কয়েকটি অর্থ তথা বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে– তাড়াহুড়ো না করা, ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া, সিদ্ধান্তে অটল থাকা, যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করা, বিরোধিতায় হিম্মত হারা হয়ে না পড়া, দুঃখ বেদনা ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া, সহিষ্ণু হওয়া, ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকা, একাগ্র ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অগ্রসর হওয়া। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এগুলো যার মাঝে থাকবে তিনিই সাফল্য ছিনিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন।

ধৈর্যের একটি চরম মুহূর্ত আছে। প্রকৃত অর্থে সেই চরম মুহূর্তে নিজেকে কর্তব্যপালনে স্থির রাখাই হলো ধৈর্য। অনেকে চরম মুহূর্তে এসে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেন না। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় চরম মুহূর্তে হজরত আবু

www.nagorikpathagar.org

জান্দাল (রা)-এর ধৈর্যধারণের ঘটনাটি ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে অলঙ্কিত হয়ে আছে। কাফিরদের নির্মম নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে, ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে শিকলপরা অবস্থাতেই পালিয়ে হুদাইবিয়া নামক স্থানে রাসূল (সা) এর নিকট হাজির হয়েছিলেন হজরত আবু জান্দাল (রা)। রাসূল (সা) তখন মক্কার কোরাইশদের সাথে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে যাচ্ছিলেন। যার মধ্যে একটি চুক্তি ছিল-মক্কার কেউ পালিয়ে এলে তাকে ফেরত দিতে হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে হাজির আবু জান্দাল (রা)। বর্ণনা দিলেন তার ওপর কোরাইশদের নির্মম নির্যাতনের। আকুতি জানালেন তাকে উদ্ধারের। ক্রান্তিলগ্ন সেই মুহূর্তে রাসূল (সা) আবু জান্দালের উদ্দেশে বললেন- হে আবু জান্দাল, ধৈর্য ও সংযমের সাথে অপেক্ষা কর। আল্লাহ তোমার ও অন্যান্য মজলুমের জন্য কোনো রাস্তা বের করে দিবেনই। সন্ধিচুক্তি হয়ে গেছে, কাজেই আমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারি না। সেই দিন হজরত আবু জান্দাল (রা) পরম ধৈর্য ধারণ করে নির্যাতনের ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়েই ফিরে গিয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী, আবু জান্দাল (রা) তার ধৈর্যের পুরস্কার পেয়েছিলেন, মুক্তি পেয়েছিলেন জুলুমবাজদের নির্মমতা থেকে। শুধু তাই নয়, মদিনাবাসী তথা রাসূল (সা) এবং তার সাহাবীরাও পেয়েছিলেন সুস্পষ্ট বিজয়।

আজকের সমস্যাসঙ্কুল নির্যাতিতদের জন্যও সেখান থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে। বর্তমান জুলুম-নির্যাতনের জগদ্দল পাথর থেকে মুক্তির জন্য আমরা প্রত্যেকে যদি হজরত আবু জান্দাল (রা)-এর ধৈর্য থেকে শিক্ষা নিয়ে এই কঠিন মুহূর্তে পরম ধৈর্য ধারণ করতে পারি তাহলে সাফল্য ও বিজয় আমাদের জন্যও সুনিশ্চিত।

৪. কুরআনের বাণী- সময়ের কসম, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে আল আসর। এই সূরাটির আয়াত তিনটি। এটি কুরআনের ছোট সূরাগুলোর অন্যতম। এই সূরাটি ছোট হলেও এর তাৎপর্য ব্যাপকতর। লেখার শিরোনামটি এই সূরারই প্রথম অংশের অর্থ। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এই সূরাতে সময়ের শপথ নিয়ে মানুষ যে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত তা তুলে ধরেছেন তার পাশাপাশি কারা ক্ষতির কবল থেকে মুক্ত থাকবে তার কথাও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন। সূরাটির পুরো অর্থ নিম্নে তুলে ধরা হলো- "সময়ের কসম। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং পরস্পরকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে" (সূরা আসর)।

www.nagorikpathagar.org

ছোট্ট এই মাক্কী সূরাটিতে মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায়, মানুষের সাফল্য-ব্যর্থতা, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং ধ্বংসের পথ বর্ণনা করেছেন। মানুষের জীবনের প্রতিটি সময়কে গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগিয়ে জীবনটাকে বদলে দেয়ার জন্য এই সূরার অনুসরণই যথে" এই সূরার তাৎপর্য উপলব্ধি করে কাজ করতে পারলে সাফল্য অনিবার্য। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন- "মানুষ যদি এই একটি সূরা অর্থাৎ সূরা আসর নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে এটিই তাদের হেদায়েত তথা সফলতার জন্য যথেষ্ট" হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হযরত ওবাইদুল্লাহ বিন হিসন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীদের মধ্য থেকে যখন দুই ব্যক্তি মিলিত হতেন তখন তারা একজন অপরজনকে সূরা আসর না শোনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না" (তাবারানি)।

মহান আল্লাহ এখানে সময়ের কসম করার যথার্থ যুক্তি আছে। আল্লাহ সৃষ্টিকুলের কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব, অভিনবত্ব প্রকাশের জন্য কখনও কসম বা শপথ করেননি বরং যে বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তার ক্ষেত্রেই তিনি সত্যতা প্রমাণ করতে কসম খেয়েছেন। সময় অতি মূল্যবান একটি বিষয়। সময় বলতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বুঝায়। এটি কোন দীর্ঘ সময় এর অর্থে নয়। ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে বের হয়ে আসা বর্তমান অতীতে নিপতিত সময়কে বুঝানো হয়েছে। অতীতের কসম হলো ইতিহাসের সাক্ষ্য। বর্তমানের কসম হলো বর্তমানের অতিবাহিত সময়। মানুষকে কাজের জন্য সময় দেয়া হচ্ছে। সময় এক ধরনের মূলধন। মূলধন নামক মানুষের এই সময় দ্রুতই অতিবাহিত হচ্ছে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে ইমাম রাযী (রহ:) একজন মনীষীর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন; তাহলো- "একজন বরফ বিক্রেতার কথা হতেই আমি সূরা আল আসরের অর্থ বুঝতে পেরেছি যে বাজারে জোর গলায় চিৎকার করে বলছিল- দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি (বরফ) গলে যাচ্ছে। দয়া করো এমন ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি (বরফ) গলে যাচ্ছে। তার এ কথা শুনে আমি বললাম এইটিই হচ্ছে আসলে 'নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' বাক্যের প্রকৃত অর্থ।

মানুষকে যে সময় (আয়ুষ্কাল) দেওয়া হয়েছে তা বরফ গলে যাওয়ার মতো দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। একে যদি নষ্ট করে দেওয়া হয় অথবা ভুল কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিই মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি। কাজেই চলমান সময়ের কসম খেয়ে এই সূরায় যা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, এই দ্রুত গতিশীল সময় সাক্ষ্য দিচ্ছে, সূরা আসরে বর্ণিত চারটি গুণাবলী শূন্য হয়ে যে মানুষ যে কাজেই নিজের জীবনকাল অতিবাহিত করে- তার সবটুকুই ক্ষতির

www.nagorikpathagar.org

সওদা ছাড়া কিছুই নয়। পরীক্ষার হলে যে ছাত্র প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে অন্য কাজে সময় নষ্ট করেছে, তাকে পরীক্ষার হলে টানানো ঘড়ির কাঁটা বলে দিচ্ছে তুমি নিজের ক্ষতি করছো। যে ছাত্র এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার কাজে ব্যয় করেছে একমাত্র সেই লাভবান হচ্ছে। আর রেজাল্টের দিন সেই ছেলেটিই সফলতা অর্জন করবে।

এ সূরায় চারটি গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যারা সময়ের বহমান স্রোতে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে-১. যারা ঈমান এনেছে ২. যারা সৎ কাজ করতে থেকেছে ৩. যারা পরস্পরকে হকের উপদেশ দিতে থেকেছে এবং ৪. যারা পরস্পরকে সবর বা ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে থেকেছে। প্রথম কাজ হলো ঈমান আনা। শুধুমাত্র মুখে স্বীকার করলেই তাকে ঈমান আনা বলা হয় না বা ঈমানের দাবি পূরণ হয় না। বরং ঈমানের তিনটি ধাপ রয়েছে। তা হলো অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, তারপর মুখে স্বীকৃতি তথা বিশ্বাস অনুযায়ী মুখে প্রকাশ করা, তৃতীয়ত বাস্তবে কাজে পরিণত করা। আল্লাহ্ বলেন- আসলে তারাই প্রকৃত মুমিন যারা আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি ঈমান এনেছে এরপর কোনরূপ সন্দেহে পতিত হয়নি। (সূরা হুজুরাত : ১৫)

দ্বিতীয়ত, ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে তারা যারা আমলে সালেহ্ তথা সৎ কাজ করতে থেকেছে। কুরআনের পরিভাষায় সালেহাত সমস্ত সৎকাজ এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের দৃষ্টিতে, যে কাজের মূলে ঈমান আছে এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে তা সৎকাজ। ঈমানের পর সৎকাজের বর্ণনার অর্থ হলো ঈমান বিহীন কোন সৎকাজের পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ নেই। সৎকাজবিহীন ঈমান একটি দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়। ঈমান ও সৎকাজ বীজ আর বৃক্ষের মতো। আল্লাহ্ এবং বান্দার হক আদায়, মা বাবার খেদমত করা, বড়দের সম্মান করা ছোটদের স্নেহ করা, আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীর হক আদায় করা, অপরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সৎ কাজ।

ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার পরবর্তী দু'টি গুণ হলো - যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা পরস্পরকে হক কথা বলা, হক কাজ করা এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে হবে। এর প্রাথমিক অর্থ হচ্ছে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের পৃথক না থেকে সম্মিলিতভাবে একটি সৎ সমাজ গড়ে তুলতে হবে। যেখানে নিজে হকের উপর অবিচল থাকার পাশাপাশি অন্যকেও এ পথে আহবান করতে হবে। মনে রাখতে হবে সমাজে একা একা ভালো থাকা যায়

www.nagorikpathagar.org

না। কেউ যদি মনে করেন তিনি ভালো থাকবেন ঘরে কিংবা মসজিদের কোণে বসে তার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। কারণ সমাজের ক্ষতির প্রভাব তার ওপরও কোন না কোন ভাবে পড়বে। ফলে একা একা হকের পথে থেকেও তিনি আসলেই ভালো থাকতে পারবেন না। সবাইকে ভাল পথে হকের পথে সত্যের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা অব্যাহত রাখার মাধ্যমেই ভাল থাকা সম্ভব।

চতুর্থ গুণটি হলো সবর বা ধৈর্য। হকের নসিহত করতে গিয়ে বা হকের সমর্থন করতে গিয়ে যে সব সমস্যা ও বাধার মুখে নিপতিত হতে হয় তার মোকাবেলায় তারা পরস্পরকে অবিচল ও দৃঢ় থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। হক এবং বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যেখানেই হক সেখানেই বাতিল আঘাত হানার চেষ্টা করে। হক তথা সত্য পথে থেকে সফলতা অর্জন করতে গেলে বাধা বিপত্তি আসবেই। ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করতে হবে। আর ধৈর্যশীলদের জন্যই আল্লাহর পুরস্কার নির্ধারিত।

www.nagorikpathagar.org

চারিত্রিক দৃঢ়তা

১. চারিত্রিক দৃঢ়তা বয়ে আনে সফলতা

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদের মান বা মূল্য নির্ধারণের কোনো মূল্যায়নসূচক নেই। মূল্য দিয়ে চরিত্রকে মূল্যায়ন করা যায় না বলেই এটিকে অমূল্য সম্পদ বলা হয়। মানুষের সার্বিক জীবনব্যবস্থায় এই অমূল্য সম্পদের কার্যকারিতা অনেক শক্তিশালী। তাই মানবজীবনে চরিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী বিষয়। ঈমানের পরে চরিত্রতেই ইসলামে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যার চরিত্র দুর্বল, সে খাঁটি ঈমানদার নয়, প্রকৃত বিশ্বাসী নয়। চরিত্র মহামূল্যবান, অতুলনীয় সম্পদ ও এক অমূল্য রত্ন। ব্যক্তির নৈতিকতা ও চরিত্রকে সুন্দর ও মার্জিত করার বিষয়টি ইসলামে কত যে গুরুত্বপূর্ণ মানবতার মহান শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদিস থেকে তা অনুমান করা যায়। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম মানুষ বলে বিবেচিত, যাদের চরিত্র উত্তম। অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হবে, যার নৈতিকতা ও চরিত্র সবচেয়ে ভালো। (বোখারি)।

মানুষ যে সমাজ ও পরিবেশে বসবাস করে সে সমাজ ও পরিবেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতা নিশ্চিত করে। সমাজ ও পরিবেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি যদি উত্তম হয় তাহলে মানুষের চরিত্রও উত্তম হয়। তবে জীবনকে সফলতার প্রান্তে উপনীত করার জন্য শুধুমাত্র চারিত্রিক উৎকর্ষতাই যথেষ্ট নয় বরং চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রয়োজন। সমাজের বহু মানুষ আছে যারা মাঝে মধ্যে স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য চরিত্রহীন হয়ে পশুত্বে পরিণত হয়। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পশুত্বে

www.nagorikpathagar.org

পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হলে চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রয়োজন। চরিত্রের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান কথা তাই সমাজে বহুল প্রচারিত হয়েছে যে, চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর বাকি সকল সম্পদ হারিয়ে গেলেও ফিরে পাওয়া সম্ভব কিন্তু চারিত্রিক সম্পদ নষ্ট কিংবা হারিয়ে গেলে তা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। সমাজে বহুল প্রচলিত সেই মহামূল্যবান বাণী হলো- **If money is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, if character is lost everything is lost.** অর্থাৎ অর্থ হারালে কিছুই হারায় না, স্বাস্থ্য হারালে কিছু হারায়, কিন্তু একবার চরিত্র হারালে সবকিছুই হারায়।

মানবজীবনে সফলতার জন্য চারিত্রিক দৃঢ়তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। চলনে-বলনে, আচার-অনুষ্ঠানে, কথা-কাজে, নিঃশ্বাসে-বিশ্বাসে চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠাই ব্যক্তিজীবনের সফলতা নিশ্চিত করে। যার চারিত্রিক দৃঢ়তা যতো বেশি তার সফলতাও ততো বেশি। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "(কিয়ামতের দিন) মুমিনের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চাইতে বেশি ভারী আর কোনো জিনিস হবে না" (আবু দাউদ) আর চারিত্রিক দৃঢ়তা মানুষের কাছ থেকেই কামনা করা হয়। কারণ মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ তাঁর সকল মাখলুকের মধ্যে মানুষকেই দিয়েছেন চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা। আর বাকি সকল সৃষ্টিকে করেছেন মানুষের অধীন। মানুষের সাথে বাকি মাখলুকের পার্থক্য এখানেই। মানুষ আর পশুর পার্থক্য নির্ণিত হয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে। মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা যদি সকল হীনতা, নীচতা, পশুত্ব ও নোংরামির উর্ধ্বে থাকে তবেই সে পশুর চাইতে শ্রেষ্ঠ, তবেই সে সফল। কষ্ট ছাড়া, ঘাম, শ্রম ও ধৈর্যের বিনিময়ে অর্জিত অনেক দিনের মানমর্যাদা সামান্য চরিত্রহীনতায় মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। মানুষকে কর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা যেমনি দেয়া হয়েছে তেমনি তার সীমাও আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে কোন পরিবেশই তৈরি হোক না কেন সেই সীমা অতিক্রম না করাই চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিজেকে সেই সীমার মধ্যে আটকে রাখতে পারাই সফলতা। মানুষ যে সৃষ্টির সেরা জীব এই আত্মপরিচয় সব সময় স্মরণ থাকলে সেটিই চরিত্রহীনতা থেকে রক্ষা করতে ভূমিকা পালন করবে। আত্মসম্মানবোধ যেমন সম্মানহানি থেকে চরিত্রকে রক্ষা করে তেমনি আত্মসংযম লোভ-লালসায় ডুবে গিয়ে চরিত্রহীনতার অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া থেকে ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। চরিত্র মানবজীবনের সৌন্দর্য আর চারিত্রিক দৃঢ়তা এই সৌন্দর্যকে কলুষমুক্ত রেখে সুষমায় প্রস্ফুটিত করে সাফল্য নিশ্চিত করে। মানবজীবনের প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি পদক্ষেপেই এই সুষমা প্রয়োজন, না হলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে অর্জিত সাফল্য।

www.nagorikpathagar.org

চরিত্রই পারে মানুষের সকল সাফল্যকে হাতের মুঠোয় এনে দিতে। তাই এই পৃথিবীর আর কোন কিছুর সঙ্গেই চরিত্রের তুলনা হয় না। চরিত্রকে অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না, এমনকি সমগ্র বিশ্বের বিনিময়েও তা কেনা অসম্ভব। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা মূল্যমান নির্ধারণ করে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না। অনেক সময় অর্থ বিশেষ বিষয়ে সীমা অতিক্রম করতে পারে না। চরিত্র অর্থের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে তেমনই একটি বিষয়। তবে যদি কেউ অর্থের বিনিময়ে চারিত্রিক সার্টিফিকেট অর্জন করে তাহলে বুঝতে হবে সেই চারিত্রিক সার্টিফিকেটের সাময়িক কোনো গুরুত্ব থাকলেও তা আসলেই অর্থহীন। মানুষ রাতারাতি বিবেককে বিসর্জন দিয়ে সাফল্য লাভ করতে চায় কিন্তু যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন আর শেষ রক্ষা হয় না। তখন কোন আর্থিক মূল্যও এই শেষ রক্ষা থেকে ব্যক্তিকে পরিত্রাণ দিতে পারে না।

চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জনে মানুষের সামনে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ থাকা চাই। আদর্শহীন মানুষ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে পালহীন তরীর মতো। কারণ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগর পালহীন তরীর যাত্রীদের সলিল সমাধি নিশ্চিত করে থাকে। এ অবস্থায় আদর্শহীনতার কারণে চরিত্রহীন মানুষকে কেউ প্রকৃত মানুষ হিসেবেই অভিহিত করে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণ আবশ্যক বলা হলেও আমরা জাগতিক ব্যক্তি, জৈবিক আদর্শকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকার পরও আমরা এটিকে এড়িয়ে চলে খড়কুটা আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ অনুকরণীয়, অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন, "তোমাদের জন্য রাসূল (সা)-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ" (সূরা আহজাব : ২১। রাসূলের আদর্শকে সর্বোত্তম অভিহিত করার পরও আমরা রাসূল (সা)-কে বাদ দিয়ে তার আদর্শকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং তাদের মতাদর্শকে অনুসরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করি। মহানবী (সা)-এর আদর্শ অনুসরণে কল্যাণ নিশ্চিত রয়েছে বলেই তাকে মানবজাতির জন্য রহমত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল কুরআনে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, "আর আমি রাসূল (সা)-কে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে রাসূল (সা)-এর জীবন অনুসরণ আমাদের দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত সফলতা ও মানবিক মুক্তি। কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা যদি ব্যর্থ

www.nagorikpathagar.org

মতবাদে জাগতিক ব্যক্তি আদর্শের পেছনেই ছুটে চলি তাহলে তারা যে রকম ব্যর্থতা ও গ্লানিকেই বহন করেছেন তারা যাদের পূর্ণভাবে অনুসরণ করবে তারাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যর্থতার পরিবর্তে সফলতা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের জাগতিক ব্যক্তি ও মতবাদের পরিবর্তে বিশ্বশান্তির অগ্রদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবা এবং ইতঃপূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূলদের জীবন-চরিত্রেরই অনুসারী হওয়া উচিত।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ নঈম সিদ্দিকী রচিত চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান বইয়ের শুরুতে প্রকাশক বলেছেন- মানুষের তৎপরতা যত বৃদ্ধি পায়, যত অধিক গুরুত্ব অর্জন করে, সেখানে শয়তানের হস্তক্ষেপও ততই ব্যাপকতর হতে থাকে। একদিকে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও স্বার্থপূজারি সভ্যতা আমাদের জাতির নৈতিক পতনকে চরম পর্যায়ে উপনীত করেছে, অন্যদিকে চলছে সমাজতন্ত্রের নাস্তিক্যবাদী চিন্তার হামলা। এ হামলা আমাদের জাতির মৌলিক ঈমান-আকিদার মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করেছে। এর ফলে ইসলামের সাথে জাতির গভীর প্রেম-প্রীতিময় সম্পর্কের ভিত্তি নড়ে উঠেছে। বিপর্যয় ও অনিষ্টকারিতার 'সিপাহসালার' শয়তান যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল হুবহু তারই চিত্র যেন আজ ফুটে উঠেছে। শয়তান বলেছিল, "আমি গোমরাহ করার জন্য মানবজাতির সামনে থেকে আসবো, পেছন থেকে আসবো, ডান দিক থেকে আসবো, বাম দিক থেকে আসবো" (সূরা আরাফ : ১৭)। আজ সামগ্রিক পরিস্থিতিতে যুবসমাজ অশ্লীলতার অতল গহ্বরে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলছে। শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে বিকিয়ে দিচ্ছে চরিত্র নামের অমূল্য সম্পদ। অথচ অশ্লীলতা এমন এক জিনিস যা মানুষকে চরিত্রের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যায়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে কোনো ধরনের অশ্লীল আচরণের ধারে-কাছেও না যাওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর প্রকাশ্য কিংবা গোপনে হোক তোমরা বেহায়া-অশ্লীল আচরণের নিকটেও যেয়ো না" (সূরা আনআমঃ ১৫১)। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে" (সূরা শামস : ৯-১০)।

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকালের সেরা মেধাবী ছাত্র শহীদ আবদুল মালেক চরিত্র সম্পর্কে একটি অমূল্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আমাদের হৃদয়কে সহসাই নাড়া দেয়। তিনি বলেছিলেন, "যেদিন আমাদের চরিত্র হবে হযরত ইউসুফ (আ)-এর মত সেদিনই আসবে কাঙ্ক্ষিত বিজয়" সরাসরি কুমন্ত্রণা প্রত্যাখ্যান করে হযরত ইউসুফ (আ) যেভাবে চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন তা সত্যিই আজকের প্রতিটি যুবকের জন্য অনুকরণীয়

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টান্ত। এ ঘটনা প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে- সে (ইউসুফ আ) বলল, "হে আমার প্রতিপালক! এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশি প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো" (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৩৩)। বর্তমান আইয়ামে জাহেলিয়াতকে হার মানানো এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে হযরত ইউসুফ (আ)-এর মত তেমনি চারিত্রিক দৃঢ়তা ছাড়া যুবসমাজের রক্ষা নেই। আজকে আমরা সমূলেই আমাদের চরিত্রকে বিকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি। অথচ চারিত্রিক শক্তি যে কত বিশাল শক্তি তা আজ আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ। চারিত্রিক শক্তির কাছে অন্য সকল শক্তি পরাভূত হতে বাধ্য।

২. মনের কথা মনে থাকে কি?

জীবন চলার পথে মানুষের কত কিছুইতো মনে থাকে না। ছাত্রের পড়া মনে থাকে না, ব্যবসায়ীর হিসাব মনে থাকে না, শ্রমিকের কাজ মনে থাকে না, কারো 'মন'- এর কথাই মনে থাকে না। জীবনের গতিপথে মানুষ নানা বিষয়ের সাথে জড়িত। মানুষের যত বিষয় তত হিসাব। কথার হিসাব, ব্যথার হিসাব, জানার হিসাব, মানার হিসাব। এই সকল হিসাব যে মনে রাখে তার নাম 'মন'। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই মনের কথা আপনার আমার মনে থাকেতো? চলতে চলতে আমরা কত পথেই না চলি, বলতে বলতে আমরা কত কথাই না বলি। কিন্তু সচেতন মন আমাকে কতটুকু চলতে কিংবা বলতে সাহায্য করে সেটার হিসাব কি কখনো আমরা মনের কাছ থেকে নিয়েছি। নাকি অবচেতন মনই আমাকে আপনাকে কত পথে চালিয়েছে কত কথা বলিয়েছে।

বুদ্ধি ও বিবেকবোধের এক সমষ্টিগত রূপ মন। চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ, ইচ্ছা এবং কল্পনার মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটে। মন কী এবং কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে অনেক রকম তত্ত্ব প্রচলিত আছে। জড়বাদী দার্শনিকরা মনে করেন, মানুষের মনের প্রবৃত্তির কোনো কিছুই শরীর থেকে ভিন্ন নয়। বরং মানুষের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত শরীরবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মন গড়ে ওঠে। আর বিশ্বাসী মানুষেরা মনকে আত্মা হিসেবে অভিহিত করেন। প্রতিটি মানুষের ভেতরে থাকা মন বা আত্মাই হলো মানুষের নিয়ন্ত্রক। ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রক সেই 'মন'-এর খবর যদি ব্যক্তির কাছে না থাকে তাহলে ব্যক্তির প্রকৃত অস্তিত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে; হারিয়ে ফেলে তার জন্মের সার্থকতা।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের মন যতক্ষণ তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, মানুষ যতক্ষণ মনের কথা মনে রাখতে পারে, ততক্ষণ মানুষের অধীনেই তার মন ন্যস্ত থাকে। মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সে মন অবচেতন হয়ে যায়। ফলে সে মন আর তার অধীনে থাকে না। সে ভাবনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ যখন অবচেতন মনে পড়ে থাকে তখনো কিন্তু তার মন কাজ করে। অবচেতন মন কোন না কোন দিক থেকে ঘুরে আসে। মানুষের মনের শক্তি এমনই। এটি বসে থাকে না। অবিরাম চলতে থাকা এই মনকে মানুষ যখন কাজ না দেয়, অলস বানিয়ে রাখার চেষ্টা করে তখন সেখানে অকল্যাণ ভর করে। মূল্যবান একটি বিখ্যাত বাণী রয়েছে, **"Empty mind is devil's workshop."** অর্থাৎ "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা" মনকে অলস বানিয়ে রাখবেন তো শয়তান তাকে তার অপকর্মের কারখানা বানিয়ে ফেলবে। তাই সর্বদা চেতন মনকে কল্যাণ চিন্তায় নিবেদিত না করতে পারলে সেটাকে অন্যায় ও অকল্যাণ গ্রাস করে নেবে।

'মন'-এর কথা আসলে মনে থাকে কি না? কিংবা মন কোথায় থাকে? এ ব্যাপারে চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ) তারই লেখা "মনটাকে কাজ দিন" বইয়ের ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন, "ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২৬ সেল নামক ১২ কামরাবিশিষ্ট দীর্ঘ দালানের এক নম্বর কামরায় আমার ১৬ মাসের জেলজীবন কাটাই। দিনের বেলা আমার কামরার সামনে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে একজন সিপাই সব সময় ডিউটিরত থাকত। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পালাক্রমে দু'জন সিপাই ৬ ঘণ্টা করে অবস্থান করত। রাতে প্রত্যেকের ৩ ঘণ্টা করে ডিউটি করতে হতো। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা সময় তাদের যেভাবে কাটত তা দেখে আমার মায়াই লাগত। কখনো একটু পায়চারি করে, কোন সময় বারান্দার লোহার সিক ধরে দাঁড়িয়ে, এক সময় দেয়ালে হেলান দিয়ে, মাঝে মাঝে বসে একটু ঝিমিয়ে কোন রকম সময়টা পার করতে হতো। ২৬ সেলের চাবির ছড়া হাতে ডিউটিরত অপর একজন সিপাইর সাথে গেটের সিঁড়িতে বসে আলাপ করা কালে তার সময়টা ভালোই কাটত বলে মনে হয়। আমি আলাপ করলে খুব খুশি হতো। ঐ এলাকার জমাদারকে এ দু'জন সিপাইর সাথে গল্পরত অবস্থায় দেখলে আমি কয়েকজনকে একসাথে পেয়ে জিজ্ঞেস করতাম, আপনারা ডিউটিতে থাকাকালে শরীরটাতো দাঁড়িয়ে, বসে বা হেঁটে সময় কাটান, কিন্তু মনটা এ সময় কোথায় থাকে এবং কী করে? প্রশ্ন শুনে একে অপরের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে আমার দিকে অসহায় চোখে তাকালে আবার ঐ প্রশ্নই করতাম। তখন একটু ভেবে পাল্টা প্রশ্ন করত, মনে হাজারো চিন্তা ভাবনা তোলপাড় করতে থাকে– পারিবারিক বিষয়, চাকরিতে সমস্যা, অভাব অনটন নিয়ে দুশ্চিন্তা, আজেবাজে কত কথা যে মনে জাগে এর কি কোনো হিসাব থাকে?

www.nagorikpathagar.org

আবার প্রশ্ন করতাম, আচ্ছা, এসব ভাবনা-চিন্তা কি নিজে নিজেই এসে ভিড় জমায়, না সচেতনভাবে একটা একটা করে বিষয় নিয়ে ভাবেন? একটু হেসে জওয়াব দিত, এর কোন ঠিকানা নেই। কখন যে কোন কথা মনে হাজির হয়ে যায় তা টেরও পাওয়া যায় না।

মনের অবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক সাহেব চমৎকারই একটি উদাহরণ দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে মানুষের মনের অবস্থা এমনই। কখন যে মনে কোন কথা হাজির হয়ে যায়, কোন চিন্তা আশ্রয় নেয় তা আসলে টেরই পাওয়া যায় না। 'মন'-এর ব্যাপারে একটা প্রচলিত কথা আছে, 'মানুষের মন আকাশের রঙের ন্যায়'। এ কথাটির একটি তাৎপর্যও আছে। কারণ আকাশের রঙের যেমন কোনো স্থায়িত্ব নেই, কখন কোন অবস্থা ধারণ করে বলা যায় না। তেমনি মানুষের মনও নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে একই বিষয়ের ওপর তার স্থায়িত্ব থাকে না। মন বড়ই বিচিত্র। মনের অবস্থা কখন যে কী রূপ ধারণ করবে তা বলা যায় না। মনের যিনি ধারক তথা ব্যক্তি, তিনিও অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না মনের ওপর। রক্ত-মাংসের বিশাল দেহের মানুষটি নিয়ন্ত্রিত হয় অদৃশ্য সেই মনের দ্বারা। মন বলছে তো গোটা দেহ সেদিকে ধাবিত হচ্ছে। মন বলেনি তো কোনোভাবেই নড়ছে না বিশাল দেহটি। অনুভবযোগ্য না হওয়ার পরও অদৃশ্য মনের প্রভাব অনেক বেশি। মনই হলো সব ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক। মনকে মনে না রেখে তাকে উপেক্ষা করে চলার কোনো উপায় নেই। যে কাজে মন সায় দেবে না সেখানে কোনো প্রাণ থাকবে না। মন+যোগ হলেই কাজে প্রাণ আসে, গতি পায়।

আপনার আমার ফেলে আসা কিছু মুহূর্তের কথা চিন্তা করুন তো। সামান্য এই জীবনের পথচলায় মন কত শত বার কত দিকে চলে গেছে, কত শত বার আবার মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে তার কি কোন হিসাব আছে? মন এই আমার নিয়ন্ত্রণে আছে আবার মুহূর্তেই আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে কত চিন্তা, দুশ্চিন্তাকে আশ্রয় দিয়েছে। আসলে মনের শক্তি এমনই। এ জন্য মনকে বলা হয় একটি শক্তিশালী যন্ত্র! এর যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা এবং ব্যাপ্তি অনেক বেশি। এ জন্য কাজ ছাড়া সে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।

মানুষের মন দুই অবস্থায় থাকে– এক. সচেতন, দুই. অবচেতন। সচেতন মনের যে রকম কার্জ ক্ষমতা আছে অবচেতন মনেরও তেমন কর্মক্ষমতা আছে। পার্থক্য হলো সচেতন মন গ্রহণ কিংবা বর্জন করতে পারে। আর অন্য দিকে অবচেতন মন কেবলমাত্র গ্রহণ করতে পারে বর্জন করতে সক্ষম নয়। অবচেতন মন যা গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করে তার ভালো-মন্দ বাছবিচার করে না। মন যেহেতু সচেতন কিংবা অবচেতন দুই অবস্থায়ই কাজ করে সেহেতু আমাদের মন নিষ্কর্মা হয়ে থাকতে পারে না। তাই মনকে সব সময় কল্যাণমূলক কাজে ব্যস্ত রাখা উচিত। না হলে নেতিবাচক কাজ মনের ভেতর প্রবেশ করে জীবনটাকেই সর্বনাশ করে দিতে পারে।

"আল্লাহ্ মানুষকে যে চিন্তাশক্তি দিয়েছেন সে আলোকে যা করে তাই মন" মনের বৈশিষ্ট্য হলো সে কাজ ছাড়া থাকে না, সে থাকে সদাব্যস্ত। মানুষ কাজ করতে করতে একপর্যায়ে ক্লান্ত হয়, শ্রান্ত হয়, বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, কিন্তু মন ক্লান্ত হয় না, শ্রান্ত হয় না, কিংবা বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। এমনকি মানুষের দেহ যখন ঘুমায় মন তখনও ঘুমায় না। মন তখনও থাকে সদা জাগ্রত। ঘুমের সময়ও কিন্তু মন স্বপ্ন দেখে। মানুষ যখন বিছানায় গা এলিয়ে দেয় মন তখনও কাজ করতে থাকে। বরং মনের কাজ তখন বেড়ে যায়। শরীর বা দেহ কাজ না করলেও তার ইন্দ্রিয়শক্তি চিন্তাশক্তি কাজ করে।

'মন'-এর কথা মনে রাখার প্রশ্ন কেন আসে? সত্যিকার অর্থে মনের কথা মনে রাখার প্রশ্ন এ জন্যই আসে যে, মন কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। এখন আমি যদি মনের খবর না রাখি। মন কি কাজ করছে তার হিসাব না নেই। সচেতনভাবে মনটাকে কাজ না দিই তখন আর কেউ তাকে কাজ দেবে, তখন সে জায়গায় শয়তান আশ্রয় নেবে। শয়তান বা ইবলিসের কাজই হলো মনটাকে কাজ দিয়ে আটকিয়ে রাখা। শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। মানুষ সৃষ্টির পর প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-কে সেজদা করতে বলার পর শয়তান অহঙ্কার প্রদর্শন করে সিজদা থেকে বিরত থাকে। তখন আল্লাহ্ তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেন। পাশাপাশি মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতাও দেয়া হয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে এসেছে, সে বলল– "আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব। তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হবো, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না" (সূরা আরাফ : ১৬-১৭) শয়তানের এ অপতৎপরতা সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন, "মানুষ এমন এক ঘোড়া যার পিঠ কখনো খালি থাকে না। যদি সে সবসময় আল্লাহকে তার পিঠে সওয়ার করিয়ে রাখে তাহলে সে নিরাপদ। যখনই তার পিঠ খালি হয় তখনই ইবলিস চেপে বসে" সুতরাং মনের খবর যদি আমরা না রাখি তাহলে শয়তানের দখলে চলে যাবে মন। কাজও হবে তার ইচ্ছায়।

www.nagorikpathagar.org

কাজের সূচনা হয় মন থেকে। কাজ হলো মানুষের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। আর এই সূচনা তথা ইচ্ছাটা আসে মন থেকেই। এখন এই ইচ্ছাটা যদি ভালো হয় কাজও হয় ভালো, আর ইচ্ছা তথা ভাবনা যদি খারাপ হয় কাজও হয় খারাপ। মানুষ যদি তার মনকে মন্দ চিন্তা দেয়, তথা মন থেকে যদি মন্দ চিন্তার উদ্রেক হয় আর সে যদি তাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে তার কাজগুলোও হবে সেই রকমই অর্থাৎ মন্দ কাজ। আমরা যদি মন্দ কাজ থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদের মনকে কাজ বা চিন্তা দিতে হবে। আর কর্মজীবনে গিয়ে ভালো কাজের চর্চা করতে হলে এখন থেকেই মনকে ভালো কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে অভ্যস্ত হতে হবে।

ব্যক্তি যত বড়ই হোক না কেন শয়তান তাকে ধোঁকা দেবেই। হোক সে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক বা সফল কোন ব্যক্তি। কোন না কোন ফাঁকে শয়তান তাকে বা তার মনটাকে মন্দ কাজ দিতে চেষ্টা করবেই। যিনি কুরআন পড়েন, হাদিস পড়েন এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন তিনিও যদি মনের খবর না রাখেন তাহলে শয়তান যেকোনো সময় তার ওপরও ভর করতে পারে। এজন্য আমরা দেখি মাঝে মধ্যে ভালো কিছু মানুষও গোমরাহির পথে পা বাড়ান। এটি শয়তানেরই কারসাজি। মনের ওপর শয়তান তার প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ পায় বলেই এমনটি সম্ভব হয়।

মনটাকে কিভাবে ভালোভাবে রাখা যায় সে চেষ্টায় আমাদের নিবেদিত হতে হবে। মনের খোঁজ রাখতে হবে। মনকে রাখতে হবে নিজের নিয়ন্ত্রণে। কারণ সকল মন্দ কাজ থেকে মনকে বিরত রাখা আমাদের জীবনের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের উত্তরণ করতে না পারলে জীবনের উন্নয়ন অর্থহীন হয়ে যাবে।

৩. অহংবোধ : ঘুণে ধরা জীবনের প্রতিচ্ছবি

মানবমনের ক্ষুদ্র কোণে লুকিয়ে থেকে যে আচরণ সুন্দর জীবনে ধ্বংসের অভিযাত্রা শুরু করে তার নাম অহংবোধ বা অহংকার প্রদর্শন। অহংকার মানবজীবনের এক মারাত্মক ব্যাধি। মারাত্মক এই ব্যাধিটি উইপোকার মতো। এটি ধীরে ধীরে মানবজীবনের সৎগুণাবলি এবং এর বিকাশের সকল রাস্তাকে বন্ধ করে দেয়। তখন ব্যক্তির সৎগুণাবলির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর তখনই পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ নিজেকে ভুলে যায়, ভুলে যায় তার আত্মপরিচয়। তাছাড়া কোনো ভালো অর্জন কিংবা ভালো কাজ করার পর যদি এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় যে লোকে দেখুক, প্রশংসা করুক- তখন এ ধরনের আত্মপ্রদর্শনীয় ইচ্ছাই মানুষকে অহংবোধের পর্যায়ে নিয়ে যায়। আর অহংবোধের

www.nagorikpathagar.org

পর্যায় থেকে মানুষ ধীরে ধীরে অমানুষের পর্যায়ে চলে গিয়ে পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। তাইতো অহংকারকে বলা হয় পতনের মূল।

অহংকার মানে হলো বড়ত্ব বা আত্মম্ভরিতার আত্মপ্রদর্শন। অন্যের চাইতে নিজেকে বড় মনে করাই এর অন্তর্নিহিত অর্থ। এর পারিভাষিক অর্থ হলো সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হলো, আমরা সুন্দর জুতা পরি, সুন্দর পোশাক পরিধান করি, এগুলো কি অহংকার হবে? তিনি বললেন, না বরং অহংকার হলো সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা। অহংকার মানবস্বভাবের একটি নিকৃষ্ট অংশ। এর উপকারিতার চেয়ে অনিষ্টকারিতা বেশি। একে দমন করে সৎকর্মে লাগানোর মধ্যেই মানুষের কৃতিত্ব বা সাফল্য নির্ভর করে। এই রোগে যে আক্রান্ত হয়, সে নিজেকে নিজে ধ্বংস করে। তার দ্বারা সমাজ, সংগঠন, রাষ্ট্র এমনকি নিজ পরিবারও আক্রান্ত হয়, সে নিজেকে নিজেই ধ্বংস করে। মানুষের মধ্যে ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ, গর্ব, অহংকার, ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতার মতো কিছু আচরণ বিদ্যমান থাকে যেগুলোর দক্ষ ব্যবস্থাপনাই কাম্য। অহংবোধ বা যেকোনো ধরনের পাপ কাজেরই উৎস হলো তিনটি। হাফেজ ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, সমস্ত পাপের উৎস হলো তিনটি– ১) অহংকার, যা ইবলিসের পতন ঘটিয়েছিল। ২) লোভ, যা জান্নাত থেকে আদম (আ)-কে বের করে দিয়েছিল। ৩) হিংসা, যা আদম (আ)-এর এক সন্তানের বিরুদ্ধে অপর সন্তানকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলেছিল। যে ব্যক্তি উক্ত তিনটি বস্তুর অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারবে সে সকল পাপ কাজ থেকেই বিরত থাকবে।

অহংকার একবার অন্তরে প্রবেশ করলে তা থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর। ইবলিস নিজেকে আগুনের তৈরি বলে মাটির তৈরি আদমকে সেজদা করতে অস্বীকার করে যে অহংবোধের জন্ম দিয়েছিল তা তাকে শয়তানে পরিণত করেছিল। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা উল্লেখ করেন, "আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সেজদা কর। সকলেই সেজদা করল, শুধু ইবলিস ছাড়া। সে অস্বীকার ও অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, অহংকারবশত আল্লাহর আদেশ অমান্য করে ইবলিস কাফের বলে গণ্য হয়ে গেল" (সূরা বাকারা : ৩৪)। অহংকার ইবলিসকে তারই সৃষ্টিকর্তার আদেশ পালন থেকে বিরত থাকতে প্ররোচিত করেছিল। ফলে সে কাফের হিসেবে গণ্য হয়ে জান্নাত থেকেই বিতাড়িত হলো। অহংকারের পরিণতি এমনই ভয়াবহ। অহংকার যারা পোষণ করে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

মানবজীবনেও যার মধ্যে অহংকার ঢুকে যায় সে তার আত্মপরিচয় ভুলে যায়। সে ভুলে যায় তার সৃষ্টিকর্তাকে। নিজে সামান্য জমাটবাঁধা পানি থেকে সৃষ্টি, মাটির সৃষ্টি এই আত্মপরিচয় ভুলে গেলেই মানুষ অহংকারী হয়। আল্লাহ এজন্য অহংকারীদের ভালোবাসেন না এবং পরকালে তাদের জন্য মন্দস্থান তথা জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না, আর জমিনের ওপর অহংকার করে চলাফেরা করো না। আল্লাহ কোনো আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না" (সূরা লোকমান : ১৮)।

আল্লাহ তায়ালা অহংকারীকে ভালোবাসেন না। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "কতই না মন্দ অহংকারকারীদের বাসস্থান" (সূরা নাহল : ২৯)। হজরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, মানুষ চায় যে, তার পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর হোক, তার জুতা জোড়া সুন্দর হোক। তিনি বলেন, আল্লাহ সৌন্দর্যময় এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো সত্যকে দম্ভের সাথে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা। (মুসলিম)। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ) বলেন, "অহংকার শিরকের চেয়েও নিকৃ" কেননা অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্বের বিরুদ্ধে অহংকার করে। আর মুশরিক আল্লাহর ইবাদত করে এবং অন্যেরও করে" হাদিসে কুদসিতে এসেছে– আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অহংকার আমার পোশাক, এই পোশাক যে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করে তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো" (সহীহ মুসলিম)। আর এক হাদিসে রাসূল (সা) বলেছেন, "অহংকারী স্বৈরাচারীদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষুদ্র কণার আকৃতিতে ওঠানো হবে। লোকেরা তাদের পায়ের তলায় পিষ্ট করবে এবং চারদিক থেকে তাদের ওপর কেবল লানত ও অপমানই আসতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের বোলাস নামক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মাথার ওপর আগুন জ্বলতে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামবাসীর মলমূত্র, ঘাম, কাশি ইত্যাদি খেতে দেয়া হবে" (সুনানে নাসায়ী জামে আত তিরমিজি)।

অহংবোধ বা অহংকার প্রদর্শন ব্যক্তির এক ঘুণে ধরা জীবনের প্রতিচ্ছবি। ঘুণে ধরা অবস্থা নিয়ে বসবাস করলে একসময় মড়মড় করে পতনের ধ্বনি শোনায়। কিন্তু অহংবোধ জীবনের এমন এক ঘুণ যা জীবনকে এমন নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে তখন আর পতনের ধ্বনি শোনা যায় না। মড়মড় শব্দ ছাড়াই সুন্দর একটি জীবনের পতন হয়ে যায়, যা আশপাশের সবাই দেখলেও অহংকারী ব্যক্তি

www.nagorikpathagar.org

দেখতে পায় না, উপলব্ধিও করে না। "অহংকার পতনের মূল, কলিজায় ধরে ঘুণ"– এই শ্লোগান একজন ব্যক্তির জীবনে ঠিক তখনই প্রতিফলিত হয় যখন অহংকার নামক এই ঘুণে ধরা অবস্থা নিয়ে ব্যক্তি তার আত্মার সমানতালে বসবাস করে। যেসব মানুষের অহংবোধ বেশি তাদের পৃথিবীটা ঠিক তেমনি অতি সঙ্কীর্ণ যেমনি তারা নিজেদেরকে বড় করে দেখে অন্যকে সঙ্কীর্ণ করে দেখে। অহংবোধের কারণে তাদের চালিকাশক্তি এতো কমে যায় যে তারা নিজেদের মধ্যেই আবর্তিত হয়, এরা বেশি দূর যেতেও পারে না, এগোতেও পারে না। একদিকে যেমন তারা নিজেদের বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারে না, অপরদিকে অন্যদেরকেও এগিয়ে যেতে দেয় না। ফলে অহংকারীর পৃথিবীতে গতিশীলতার পরিবর্তে নেমে আসে স্থবিরতা।

অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করার মাধ্যমে নিজের মাঝে এক ধরনের মিথ্যা অনুভূতি জাগ্রত করে। এই মিথ্যা অনুভূতিই ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে অন্যায়, অনাচার সৃষ্টির। পবিত্র কুরআনে গর্ব, অহংকার ও দম্ভ না করার বিষয়ে স্পষ্ট সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, "তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই দম্ভভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না" (সূরা বনি ইসরাইল : ৩৭)। নিজের আত্মপ্রশংসা করে নিজেকে যতই বড় ভাবা হোক না কেন নিজেকে পর্বত উচ্চতায় কখনোই উপনীত করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে নিজের ঢোল নিজে না পেটানোই কল্যাণকর। কারণ নিজে কত বড় তার জবাব অন্য কেউ দেবেন। আর আপনাকে যে বড় বলে সে বড় নয়। বরং লোকে যাকে বড় বলে সেই বড় হয়। কার কত বড়ত্ব তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অতএব তোমরা আত্ম-প্রশংসা করবে না, কে মুত্তাকি এ সম্পর্কে তিনিই সম্যক জ্ঞাত" (সূরা নজম : ৩২)।

মানুষকে হেয়প্রতিপন্ন করা, অবজ্ঞা করা, তাদের ঘৃণা করা, নিজের সম্পর্কে অতি উচ্চ মনোভাব পোষণ করা আর অন্যদের ছোট বা নিচু মনে করা, অন্যকে ছোট প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে নিজেকে জাহির করা, বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করা ইত্যাদি মনোভাব অহংকারের সূচনা করে। যখন মানুষ নিজেকে অনেক বড় মনে করে, নিজের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে, নিজেকে অন্য সবার চাইতে উত্তম মনে করে; আর এটাই তাকে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহর সৃষ্টিকে ঘৃণা, অবজ্ঞা আর হাসিঠাট্টা করতে, যা প্রতীয়মান হয় তার কথা এবং কাজে। এই অহংকারের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, "(অহংকারবশে) তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে

www.nagorikpathagar.org

উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ্ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না" (সূরা লোকমান : ১৮)। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদিসে প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, "একজন মুসলিমের জন্য এটা অনেক বড় একটি গুনাহের কাজ যদি সে তার অপর ভাইকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার চোখে দেখে" (সহীহ্ মুসলিম)।

অধিক ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, জ্ঞান-গরিমা, মান-সম্মান, বংশমর্যাদা এবং উচ্চ পদমর্যাদা মানুষকে অনেক সময় অহংকারী করে তোলে। অধিক ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। অথচ মানুষ তা ভুলে যায়। অহংকারের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রকার হলো ইলম তথা জ্ঞান-গরিমার অহংকার। মান-সম্মান, বংশমর্যাদা এবং উচ্চ পদমর্যাদা মানুষের মধ্যে অনেক সময় অহংকার সৃষ্টি করে। অথচ এগুলো মানবকল্যাণে অবদান রাখার বিষয়। পদমর্যাদা একটি কঠিন জবাবদিহিতার বিষয়। যিনি যত বড় দায়িত্বের অধিকারী, তাকে তত শক্ত জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "মনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে" যে ব্যক্তি পদমর্যাদা বা দায়িত্ব পেয়ে অহংকারী হয় এবং পদের অপব্যবহার করে তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরশাদ করেন, " আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে লোকদের ওপর দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন, অতঃপর সে তার লোকদের সাথে খেয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার ওপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন। বংশমর্যাদা মানুষের উচ্চ সম্মানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মানদন্ড। এই মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে, যতক্ষণ বংশের লোকেরা বিনয়ী ও চরিত্রবান থাকে। উক্ত দু'টি গুণ যত বৃদ্ধি পায়, তাদের সম্মান তত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি সেখানে কথায় ও আচরণে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, তাহলে কচুপাতার পানির মতো উক্ত সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়।

মানুষ বহু পরিশ্রম করে সাফল্য অর্জন করে। এই সাফল্য অর্জনে সাধারণত শিক্ষক, পিতা-মাতা, বন্ধু, সহকর্মীসহ অনেকের অবদান থাকে। কিন্তু অনেক সময় মানুষের অর্জিত সাফল্য ধ্বংস হয় অহংকারে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে অহংকারীরা সফল হবে না উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "যারা নিজেদের নিকট কোনো দলিল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের আছে শুধু অহংকার, যা সফল হওয়ার নয়। অতএব, আল্লাহর শরণাপন্ন হও; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (সূরা আল-মু'মিন : ৫৬)। প্রখ্যাত সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, "মানুষের ধ্বংসের প্রধান দু'টি লক্ষণ হচ্ছে অহংকার ও নৈরাশ্য" মানুষ যখন নিজের অর্জনটাকে বড় করে দেখে

www.nagorikpathagar.org

গর্ব প্রকাশ করে, নিজের মাঝেই অহংকারের পরিবেশ সৃষ্টি করে তখন তার সেই অর্জন ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ তখনই অহংকারী হয় যখন তার মাঝে আত্মগরিমা জেগে ওঠে। শিক্ষকের চাইতে ছাত্র অনেক বেশি মেধাসম্পন্ন হতে পারে, তাই বলে শিক্ষককে ছোট ভাবলে আত্ম-অহংকার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ছাত্রের স্মরণ রাখা উচিত তার মেধা-যোগ্যতায় তার শিক্ষকেরই অবদান রয়েছে। পিতা-মাতার চেয়ে মান-মর্যাদায় বড়ত্বের অংশ ধরে অহমিকা প্রকাশের আগে সন্তানকে চিন্তা করা উচিত তার পিতা-মাতা তাকে জন্ম দিয়েছেন, লালন পালন করে বড় করেছেন। সন্তান যতই বড় হোক না কেন পিতা-মাতার ওপরে নিজেকে বড় মনে করা মানায় না। পতনের আগেই অহংকারী শাসকের মনে রাখা উচিত যেকোনো সময় তার পতন হতে পারে। যে জনগণ তাকে সমর্থন দিয়েছে, অপকর্মের কারণে সেই জনগণই তার ওপর যেকোনো সময় বিক্ষুব্ধ হতে পারে। সুপরিচিত ব্যক্তির অহংকার প্রকাশের আগে ভাবা উচিত কাদের কল্যাণে এই পরিচিতি। দায়িত্বশীল, কর্তৃত্বশীল ও ব্যক্তিত্বশীলকে অহংকারী হওয়ার আগে চিন্তা করা উচিত এ পর্যায়ে আসার পেছনে কার বা কাদের অবদান রয়েছে। যে সংগঠন কিংবা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে ব্যক্তির এত বড় অবস্থান, যে জনশক্তি কিংবা জনগণের কল্যাণে ব্যক্তির এত বড় সম্মান ও মর্যাদা সে কোনোভাবেই অহংকারী হতে পারে না। আর পূর্বাপর উপেক্ষা করে নিজের বড় হয়ে ওঠার সিঁড়িকে যদি কেউ অস্বীকার করে অহমিকা প্রদর্শন করে তারতো পতনই একমাত্র সমাধান।

৪. বিনয় নম্রতা ও সততা ধারণ করুন

উন্নত, সুন্দর এবং সাফল্যমণ্ডিত জীবন একজন ব্যক্তির কাছে অনেক আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। প্রতিটি ব্যক্তিই তার জীবনটাকে সুন্দর, উন্নত এবং সাফল্যমণ্ডিত দেখতে চায়। কেউ এমন প্রত্যাশিত জীবন গঠন করে, কেউ গঠন করতে পারে না। এমন জীবন গঠনের জন্য ব্যক্তির জীবনে বিনয়, নম্রতা ও সততার উপস্থিতি প্রয়োজন। কারণ ব্যক্তি যত বিনয়ী ও নম্র হয় জীবন তার তত উন্নত হয়। আর সততা জীবনটাকে অনেক সুন্দর করে সাফল্যমণ্ডিত করে। বিনয়, নম্রতা ও সততার উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির মর্যাদাও বাড়ে। এ প্রসঙ্গে অনুপম আদর্শের অধিকারী রাসূল (সা) বলেছেন, "যে আল্লাহর জন্য বিনয় দেখাল, তাকে তিনি অনেক উঁচুতে স্থান করে দেন" (মুসলিম)। মুসনাদে আহমদের এক হাদিসে রাসূল (সা) বলেছেন, "আল্লাহপাকের জন্য যে যত বেশি নিচু হবে অর্থাৎ বিনয়ী হবে (এই বলে রাসূল সাঃ নিজের হাতকে মাটির দিকে নামিয়ে দেখালেন), আল্লাহপাক তাকে তত বেশি উঁচু করবেন (রাসূল সাঃ তার হাতের তালু ওপরের দিকে উঠিয়ে দেখালেন) অর্থাৎ মানুষের কাছে সম্মানিত করবেন"

www.nagorikpathagar.org

বিনয়ের আসল অর্থ হচ্ছে সত্যকে দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নেয়া। এর আরেকটি অর্থ নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে না করা। প্রখ্যাত মনীষী হজরত হাসান বসরি (রহ:) বলেছেন, নিজের ঘর থেকে বের হওয়ার পর যেকারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাকে নিজের চেয়ে ভালো এবং নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করার নামই বিনয়। মানুষের জীবনে যত উত্তম গুণাবলি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম উত্তম গুণ হলো বিনয় ও নম্রতা। বিনয় ও নম্রতা উত্তম চরিত্রের ভূষণ। এই বিনয় ও নম্রতা দ্বারা মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। পারে সাফল্য ছিনিয়ে আনতে। পরম শত্রুকেও বিনয় ও নম্রতা দ্বারা বশে আনা যায়। একদিন খোতবা পাঠের সময় মিম্বরে দাঁড়িয়ে হজরত ওমর (রা) বলেন, "হে মানুষ তোমরা নম্র হও, কেননা আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী ও নম্র হয় আল্লাহ্ তাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন"

অন্যকে জয় করার সহজ পথ হলো বিনয়, নম্রতা ও সততা। বিনয়, নম্রতা ও সততা দিয়ে সহজেই অন্যের হৃদয় জয় করা যায়, অন্যকে কাছে টানা যায়– যার মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবারা। বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই তারা মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। বিনয়ী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ যেমন ভালোবাসেন, তেমনি মানুষও তাকে ভালোবাসেন। এ সম্পর্কে হজরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে– তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ স্বয়ং নম্র, তাই তিনি নম্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি কঠোরতার জন্য যা দান করেন না; তা নম্রতার জন্য দান করেন। নম্রতা ছাড়া অন্য কিছুতেই তা দান করেন না" (মুসলিম)। যে আল্লাহর উদ্দেশে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা ইরশাদ করেন, "যারা তোমার অনুসরণ করে সেসব বিশ্বাসীর প্রতি বিনয়ী হও" (সূরা আশ্-শুআরা : ২১৫)। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল এবং তার সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফিরদের প্রতি বজ্রকঠোর। আর নিজেরা নিজেদের প্রতি বড়ই করুণাশীল বা বিনয়ী" (সূরা আল ফাতহ : ২৯)। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আল মায়েদার ৫৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দীন থেকে ফিরে যায়, আল্লাহ্ আরও অনেক লোক তৈরি করবেন; যারা হবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ্ হবেন তাদের প্রিয়। যারা মুমিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর" মহান আল্লাহ্ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন, "তারাই তো আল্লাহর প্রকৃত বান্দা যারা জমিনে নম্রতার সঙ্গে চলাফেরা করে। আর যখন মূর্খ লোকেরা তাদের সঙ্গে আল্লাহর বিষয়ে তর্ক করে তখন তারা বলে দেয় তোমাদের প্রতি সালাম" (সূরা আল ফুরকান : ৬৩)।

www.nagorikpathagar.org

বিনয় ও নম্রতার পাশাপাশি সততাকে ধারণ করা আবশ্যক। কারণ যে সততাকে ধারণ করে সে বিনয়ী ও নম্র হয় এবং সে জীবনে বড় হয়, সাফল্যের অধিকারী হয়। বিনয়, নম্রতা ও সততা- এগুলো মহৎ গুণ। এ গুণে গুণান্বিতরা মহৎ হয় বলেই সমাজে তাদের আসন সুউচ্চে। বিনয় নম্রতাকে সাথে নিয়ে সত্যের লালন মানবজীবনের এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জে বিজয়ীরাই সাফল্যের সন্ধান পায়। এই চ্যালেঞ্জে উপনীত হওয়ার জন্যই জীবনের প্রতিটি দিনে প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি কাজের ভেতর দিয়ে সত্যকে লালন করতে পারাটাই সবচেয়ে বড় সার্থকতা। যিনি যত বেশি এই সার্থকতাকে অর্জন করতে পেরেছেন তিনি তত বেশি সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে নিজেকে রাঙিয়েছেন, জগৎ রাঙিয়েছেন। সততার ওপর জীবন পরিচালনা করা শুধুমাত্র সুসময়ের অনুসরণীয় কাজ নয় বরং প্রতিকূল অবস্থায়ও একে ধারণ করার মধ্যেই রয়েছে বিরাট সার্থকতা। প্রতিকূল মুহূর্তে সততাকে ধারণ করে দুঃসময়কেও প্রতিহত করা যায়।

বিনয়, নম্রতা এবং সততার লালন নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের মানুষের জন্য নির্ধারিত নয়, বরং এগুলো প্রত্যেক ধর্মের, প্রত্যেক জাতির মানুষের নৈতিকতার সাথে জড়িত। সাফল্য অর্জনকারী মানুষ এই গুণগুলোকে যদি ধারণ করতে না পারেন তাহলে তিনি সাময়িক সফল হতে পারেন কিন্তু নৈতিকতাবোধসম্পন্ন সফল মানুষ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অসৎ পথে, অসৎ পদ্ধতিতে সাফল্য অর্জনের চেয়ে হেরে যাওয়া অনেক ভালো, সম্মানের সঙ্গে হেরে গেলে নিজের অভাব বা দুর্বলতা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। পরীক্ষায় নকল করে পাস করার চেয়ে ফেল করাই অনেক ভালো নয় কি? কারণ ফেল করার কারণ খুঁজে বের করে নিয়ে পরবর্তী প্রস্তুতি দিয়ে দুর্বল বিষয়গুলোতে উত্তীর্ণ হওয়াটাই মূল সফলতা। নকল করে সাময়িক সাফল্য অর্জিত হতে পারে, কিন্তু যখন কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগ শুরু হবে তখন ব্যর্থতার গ্লানি সেই পাস করা সাফল্যকে ধুয়ে মুছে মলিন করে দেবে। তখন আফসোস করা ছাড়া কোনো উপায়ই থাকবে না।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন বিনয়, নম্রতা, সততা ও নৈতিকতা- এগুলো পুরাতন কাসুন্দি। আধুনিক সমাজে এসব অচল। প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসের সময় ও সভ্যতার এমন ঘটনা জানা নেই যখন এই মূল্যবোধগুলোকে অস্বীকার করে কেউ সফল হয়েছে। একজন সফল ব্যক্তি তাকেই বলা যায় যার মাঝে দয়া, সাহস, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতার পাশাপাশি বিনয়, নম্রতা, সততা ও নৈতিকতার গুণ থাকে। আমরা অনেক সময় সততাকে পদদলিত করে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি। একটি মিথ্যাকে ঢাকার জন্য আরেকটি মিথ্যা বলি। কারো কারো ক্ষেত্রে এটি একটি স্বাভাবিক অভ্যাসেও পরিণত হয়। তখন তার কাছে সততার পরিবর্তে

www.nagorikpathagar.org

মিথ্যাই মূল হাতিয়ারে পরিণত হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে মিথ্যার এই হাতিয়ার শুধুমাত্র ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না বরং সমাজ জীবনে বিপর্যয়ও ডেকে আনে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা মিথ্যার সঙ্গে সত্যের মিশ্রণ করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না" (সূরা বাকারা : ৪২)। সততা ব্যক্তিকে উন্নত করে, মর্যাদাবান করে তোলে, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কেউ হয়তো সাময়িক উন্নতি করে কিন্তু সত্যের আলো উদ্ভাসিত হলে সাফল্যের চূড়া থেকে তার মুহূর্তেই পতন ঘটে। তাই ছোটখাটো মিথ্যাও পরিত্যাগ করা উচিত, কেননা মিথ্যা আরো মিথ্যার জন্ম দেয়। সাফল্য অর্জনে সততা অবলম্বন করাই উত্তম ব্যবস্থা। নকল করে পরীক্ষায় হয়তো কৃতকার্য হওয়া যায়, ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনের যে সাফল্য সেই সাফল্য অর্জন করা যায় না। তাইতো বলা হয়ে থাকে **Honesty is the best policy**।

আমাদের আচরণ ও ব্যবহার আমাদের চিন্তা, চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। আমি যে সাফল্য অর্জনের পেছনে ছুটে চলতে গিয়ে আমার ঘাম, শ্রম, পরিশ্রম ঢেলে দিচ্ছি, সেই পথ চলায় যদি আমি বিনয়, নম্রতা ও সততাকে ধারণ না করি তাহলে আমার অর্জিত সাফল্য হবে ঐ বৃক্ষের ন্যায় যেই বৃক্ষে তার ডাল-পালার চেয়ে আগাছাই শক্তিশালী। কার্যত আমার অর্জিত সাফল্য হবে তখন মিথ্যাশ্রিত, বিনয় নম্রতাহীন আচরণের বহিঃপ্রকাশ। ইমাম শাফেয়ি (রহ) বলেছেন, বিনয়, নম্রতা সত্যিকার মানুষের লক্ষণ আর অহঙ্কার, ধৃষ্টতা মন্দ লোকের আচরণ। হজরত আবু বকর (রা) বলেন, "বিনয়, নম্রতা গরিবের জন্য একটা উত্তম অভ্যাস, কিন্তু ধনীর বিনয় উচ্চস্তরের চরিত্রবিশেষ"

www.nagorikpathagar.org

শৃঙ্খলা

১. শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা জীবন-সৌন্দর্যের নান্দনিক প্রতিচ্ছবি

চলতে ফিরতে বিভিন্ন স্থানে 'শৃঙ্খলা বজায় রাখুন' বাক্যটি কত শত বার যে দেখেছি তার কোনো হিসাব নেই। অফিস আদালত টার্মিনাল যানবাহন কোথায় দেখিনি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এত শতবার দেখার পরও কখনো সেভাবে একবারও ভাবার চেষ্টা করিনি এই বাক্যটির গুরুত্ব কতটুকু, কেনইবা সব জায়গায় এই বাক্যটি সবাই ব্যবহার করছে। প্রচলিত একটি কথা আছে শৃঙ্খলাই জীবন। বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের সচেতনতার লক্ষ্যে 'শৃঙ্খলাই জীবন' স্লোগানটি প্রতিপাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সে হিসেবে জীবনের আরেক নাম শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা জীবনের এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের নাম। তার পাশাপাশি জীবন-সৌন্দর্যের আরেক নাম পরিচ্ছন্নতা। শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা জীবন-সৌন্দর্যের নান্দনিক প্রতিচ্ছবি।

জীবন যখন এক যুদ্ধের নাম তখন এ যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য সবাই মুখিয়ে থাকে। অংশ নেয় তীব্র প্রতিযোগিতায়। তীব্র এ প্রতিযোগিতায় শৃঙ্খলা যদি না থাকে তাহলে বিজয়ী হওয়াতো দূরের কথা ছিটকে পড়ার আশঙ্কাই থাকে বেশি। একজন ব্যক্তির জীবনে বহু ধাপ আছে। বহু ধাপ অতিক্রম করেই ব্যক্তিকে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছতে হয়। তখন প্রতিটি ধাপেই তাকে অতি সন্তর্পণে এগোতে হয়। কোন এক ধাপে যদি ব্যক্তি হোঁচট খায় তাহলে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছা ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ধাপে সফলতার সাথে অগ্রসর হওয়ার জন্য শৃঙ্খলা প্রয়োজন। শৃঙ্খলা ছাড়া ব্যক্তিজীবনে কেউ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কখনো পৌঁছতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

জীবনের সর্বাবস্থায় প্রতিটি পদক্ষেপে শৃঙ্খলা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের পরিমন্ডলে শৃঙ্খলিত না হলে সমাজ ভেঙে পড়তে বাধ্য। ব্যক্তি যেখানে নিজেকে গড়ে তোলে আগামীর জন্য, সেখানে তার মধ্যে যদি শৃঙ্খলা না থাকে তাহলে গড়াতো দূরের কথা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা থেকেই তার ছিটকে পড়ার আশঙ্কা বেশি। ছাত্রজীবনে, পরিবারে, সমাজে, সংগঠনে, ক্যাম্পাসে, পাঠাভ্যাসে যদি শৃঙ্খলার চর্চা না হয় তাহলে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যখন পা বাড়াবে তখন তা হবে জীবনের জন্য দুর্বোধ্য দেয়াল। আগে শৃঙ্খলার চর্চা না থাকায় কর্মজীবনকে বেশি কষ্টসাধ্য এমনকি কঠিন আজাবের মত মনে হবে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শৃঙ্খলাহীন জীবন হালহীন তরী আর কূলকিনারাহীন নদীর মত।

পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই শৃঙ্খলার অধীন। যদি তা-ই না হতো তাহলে সব ধ্বংস হয়ে যেত। এই বিশাল পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছুই তার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলছে। আল্লাহতায়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেন, "আর প্রত্যেকেই তার আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে" (সূরা ইয়াসিন : ৪০)। যুদ্ধক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ছাড়া কেউ জয়লাভ করতে পারে না। জীবনে সাফল্য লাভের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে সাফল্য ছিনিয়ে আনা এক বিশাল যুদ্ধের নাম। এই সাফল্য অর্জনে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই। ওয়াটার লুর যুদ্ধে নেলসন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে শক্তিশালী নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। পরে পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, কী এমন শক্তি ছিল নেলসনের যা তাকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিল। জানা গেল, শৃঙ্খলাই তাকে বিজয়ী করেছিল। স্যার উইনস্টন চার্চিলের মতে, যুদ্ধক্ষেত্র এমনকি সর্বক্ষেত্রেই শৃঙ্খলাই সাফল্য অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

যে ছাত্র নিয়মিত পড়াশোনা করে না, ক্লাসে অংশগ্রহণ করে না, প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন আদায় করে না, পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলাকে গুরুত্ব দেয় না, নিয়মিত যথাসময়ে ঘুম থেকে ওঠে না, ইবাদত করে না আবার নিয়মিত যথাসময়ে ঘুমাতেও যায় না, তার জীবনকে প্রকৃত ছাত্রজীবন না বলে এক কথায় নিয়ম-নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবন ছাড়া আর কী বলা চলে। এ সকল ছাত্রই জীবনের গতি হারিয়ে ফেলে, স্বাস্থ্য হারায়, রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হয়, আর বছর শেষে তাদের সাফল্যো খাতায় অর্জন শূন্য। তারা সফলতার দেখা কোনো দিনই পায় না। গোল্ডেন এ+ তো দূরের কথা, পাস করে কোনো রকম সাফল্য ছিনিয়ে আনাই তাদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়ে। কারণ, তারা ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

শৃঙ্খলার পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন জীবন ব্যক্তিকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে। পরিচ্ছন্নতাই জীবনের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য। ব্যক্তিজীবনের পরিচ্ছন্নতা, নিজের পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা এবং মনমানসিকতা ও চিন্তার পরিচ্ছন্নতা জীবন-সৌন্দর্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু সফলতা অর্জন করলেই ব্যক্তি বিজয়ী হয় না বরং জীবনের পরিচ্ছন্নতা সফলতাকে পূর্ণতা দান করে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ পরিচ্ছন্নতা অর্জনকারীকেই সফল বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, "সে-ই সফলকাম হয়েছে যে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেছে" (সূরা আ'লা :১৪)।

পরিচ্ছন্নতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটায়। আমাদের অনেকেই আছেন যারা পোশাকের চাকচিক্যেই পরিচ্ছন্নতার ভাব দেখান। বাস্তবে পরিচ্ছন্নতা থেকে তাদের অবস্থান অনেক দূরে। এরা যখন কোনো মজলিশে হাজির হন তখন এদের শরীর থেকে নিঃসৃত ঘামের দুর্গন্ধ উপস্থিতিকে অস্বস্তিতে ফেলে। অনেকে আছেন যখন কথা বলেন, তখন মুখ থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হয় যে শ্রোতার বমি হওয়ার অবস্থা হয়। এরা কবে যে দাঁতে ব্রাশ ব্যবহার করেছে তারাই ভালো বলতে পারেন। কেউ এমন আছেন যাদের দিকে তাকালে মনে হবে শার্ট প্যান্টে দুনিয়ার সবার চাইতে তাদের সুন্দর এবং স্মার্ট লাগছে। কিন্তু যখন এরা জুতা থেকে পা বা পায়ের মোজা বের করেন তখন দুর্গন্ধে উপস্থিত সবাইকে নাক ধরতে বাধ্য করেন। পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে বলেন, "তোমরা তোমাদের পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ" (সূরা মুদ্দাচ্ছির : ৪)। পরিচ্ছন্নতা অর্জনকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে, "অবশ্যই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালোবাসেন" (সূরা বাকারা : ২২২)। হজরত আবু মালেক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন: "পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ" (মুসলিম)। পরিচ্ছন্ন জীবনের পাশাপাশি মনমানসিকতাকে প্রফুল্ল রেখে সাফল্য অর্জনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের পরিবেশেরও পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, অতএব তিনি পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন" (তিরমিজি শরিফ)।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে শরীরের সুস্থতা নিবিড়ভাবে জড়িত। আমরা অনেকে আছি ব্যস্ততার কারণে কিংবা আলসেমি করে যথাসময়ে নিজেদের কাপড় পরিষ্কার করি না। মাসে কোনো একদিন কখনো বা সপ্তাহে অনেকগুলো কাপড় আমরা একসাথে ধোয়ার চেষ্টা করি। ছাত্রজীবনে এ প্রবণতা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে আমি আমার সেজ ভাই নুর মুহাম্মদ ভাইয়ের শিখিয়ে দেয়া একটি পদ্ধতি এখনো অনুসরণ করার চেষ্টা করি। সেটা হলো ধোয়ার উপযুক্ত থাকলে

www.nagorikpathagar.org

প্রতিদিন কমপক্ষে একটি কাপড় ধোয়া। প্রতিদিন গোসলে যাওয়ার আগে ধোয়ার জন্য অন্তত একটি কাপড় নিয়ে গোসল করতে যাওয়া। তাহলে সপ্তাহ কিংবা মাস শেষে আর অনেকগুলো কাপড় একসাথে ধোয়ার কষ্ট সইতে হবে না। কাপড়ও নোংরা অবস্থায় পড়ে থাকবে না। কাপড় গুছিয়ে রাখা, নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, যথাসময়ে চুল কাটা, নখ কাটা, নিজের বিছানা গোছগাছ করে রাখা, পড়ার টেবিল সুন্দর করে গুছিয়ে সাজিয়ে রাখা-এসব কাজ খুবই নগণ্য হলেও এগুলো ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটায়।

পরিচ্ছন্নতার সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য অনেক দামি কিংবা অসংখ্য জামা কাপড়ের প্রয়োজন নেই বরং দু-একটি পোশাকই পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্য যথে" যদি সেগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকালের সেরা মেধাবী ছাত্র শহীদ আবদুল মালেকের একটি মাত্র জামা ছিল। কিন্তু এই একটি জামা দিয়েই তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ছুটে বেড়িয়েছেন ঢাকা শহরের প্রতিটি অলিগলি। কিন্তু কখনো তিনি অপরিচ্ছন্ন থাকেননি। সময়মত ধুয়ে শুকিয়ে এই একটি জামা গায়ে দিয়েই আবার বেরিয়ে পড়েছেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে। পোশাক পরিধানের সময় একটি বিষয়ে আমাদের অনেক বেশি সতর্কতা জরুরি। তা হলো টাখনুর নিচে প্যান্ট বা পায়জামা পরিধান না করা। এ ব্যাপারে আমরা অনেকেই বিষয়টি জানি না, আবার জেনেও সতর্কতা অবলম্বন করি না। এ প্রসঙ্গে দু'টি হাদিস উল্লেখ করছি- হজরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির সাথে কথা তো বলবেনই না বরং তাদের দিকে তাকিয়েও দেখবেন না। এমনকি তিনি তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না বরং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কারা? তবে এরা তো ধ্বংস, তাদের বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা তিনবার বলেছেন। তারা হলো– ১. যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে। ২. যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে ব্যবসার পণ্য বিক্রি করে। ৩. যে ব্যক্তি কারো উপকার করে আবার খোঁটা দেয়। (মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্)। এ প্রসঙ্গে হজরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, "কাপড়ের যে অংশ টাখনুর নিচে থাকবে তা জাহান্নামের আগুনে প্রজ্বলিত হবে" (সহিহ বুখারি)।

শৃঙ্খলা এবং পরিচ্ছন্নতা মানবজীবন পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দু'টি উপাদান। এ দু'টি উপাদান জীবনকে সুন্দর করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, শৃঙ্খলিত রাখে, পবিত্র রাখে। সুন্দর এবং কল্যাণময় শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য যেমন শৃঙ্খলা

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন তেমনি সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যও প্রয়োজন পরিচ্ছন্নতা। প্রচলিত একটি কথা আছে তাহলো শৃঙ্খলাই শৃঙ্খলমুক্তির পথ। আরেকটি কথাও বর্তমানে খুব প্রচলিত, শৃঙ্খলাই জীবন। আমাদের উচিত সুশৃঙ্খল জীবনের অধিকারী হওয়া। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নান্দনিক সুন্দর এক জীবন গড়া।

২. পরাভূত হতে না চাইলে রাগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্রোধ দমন করুন

জীবন চলার পথে মানুষকে অনেক নেতিবাচক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কেউ পারেন না। যারা পারেন তারা কাজের সফলতা নিয়ে ঘরে ফিরেন। আর যারা পারেন না তারা জীবনযুদ্ধে পরাভূত হন। মানুষের যেসব নেতিবাচক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো রাগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্রোধকে দমন করা। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে অনেক মানুষই এই রাগ ও ক্রোধ নামক বিধ্বংসী ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা দমন করতে পারেন না। 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'– যারা প্রসিদ্ধ এই স্লোগানে বিশ্বাস করেন তারাও রাগ করেন। হেরে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি করেন। তারা যেমন রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, তেমনি পারেন না ক্রোধকে দমন করতে। ছাত্রজীবন কি চাকুরিজীবন, একাডেমিক ব্যস্ততা কি পারিবারিক, সামাজিক কিংবা সাংগঠনিক ব্যস্ততা– এসবের মাঝে যারা রাগ ও ক্রোধের মতো মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত তারা কোনোভাবেই সফল হন না কিংবা সফলতার কাছে গিয়েও তাদের অর্জন ফসকে যায়। মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলে আকরাম (সা)-ও রাগ বর্জন করার নসিহত করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অল্প কথায় কিছু নসিহত করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, রাগ বর্জন করো। সাহাবি কয়েকবার বললেন, আরও নসিহত করুন। প্রত্যেকবারই রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, রাগ বর্জন করো। (বোখারি)

রাগ এবং ক্রোধ দু'টি পরস্পরের পরিপূরক। বলা যায় মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। রাগ হলো ক্রোধের প্রাথমিক অবস্থা। এটি মানুষের এক সহজাত অনুভূতি। মানুষের জীবনে উত্থান-পতনের সাথে সাথে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো চাপ ক্ষণস্থায়ী, কোনটা বা একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়। চাপ যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, যখন মানুষের চাওয়া পাওয়া আর তার নিজের মতো করে এগোয় না, তখন তার মধ্যে এক ধরনের নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়। সময়ের সাথে সাথে নৈরাশ্য কেটে কিছু কিছু মানসিক ক্ষত সেরে ওঠে বা ব্যক্তি আত্মসংযমবলে ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক হয়ে কিছু বিষয় নিজেই সামলে নেয়। তবে যখন মানুষ ব্যর্থ হয় তথা এই নৈরাশ্য কিংবা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা জীবনের অন্যান্য সাধারণ কর্মকাণ্ডের সাথে

www.nagorikpathagar.org

খাপ খাওয়াতে না পারে বা বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হয় তখন তার মাঝে রাগ ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। রাগ ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশের আরো কিছু কারণ আছে। মানুষ যখন হতাশা, অসন্তুষ্টি, অপছন্দ বা কোনোরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয় বা কোনো ভীতিকর অবস্থায় পড়ে তখনও রাগ-ক্রোধের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও মানুষ যখন কোনো কারণে দুঃখ পায় কিংবা একাকিত্বে ভোগে তখন একেকজন একেকভাবে তার রাগকে প্রকাশ করে। রাগ মানুষের শরীরে এক ধরনের এডরিনালাইন হরমোন নিঃসরণ করে, যার ফলে পেশিসমূহে উত্তেজনা, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি ও ব্লাডপ্রেশার বেড়ে যায়। অর্থনৈতিক সমস্যা-সঙ্কট ও ঝগড়া-বিবাদ, মাদকাসক্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্যায়-অবিচার-জুলুম, প্রিয়জন দ্বারা কটাক্ষের শিকার, প্রতিহিংসা, আত্মসম্মানে আঘাত ইত্যাদি কারণেও ব্যক্তির মানসিক চাপ এবং ক্ষেত্রবিশেষে মনস্তাত্ত্বিক উত্তেজনা বাড়ে, যার ফলে রাগ বা ক্রোধের সৃষ্টি হয়। মুক্ত বিশ্বকোষ **Wikipedia**-তে রাগ বা ক্রোধ সম্পর্কে বলা হয়েছে– **"Anger or wrath is an intense emotional response. It is an emotion that involves a strong uncomfortable and emotional response to a perceived provocation hurt or threat."**

মানুষের জীবনে রাগ অতি স্বাভাবিক এক অনুভূতি। তবে সমস্যা তখনই যখন মানুষ তা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতে না পারে। একজন ব্যক্তি ততখানি সফল যতখানি সুচারুরূপে তিনি জীবনের নানা নেতিবাচক দিকগুলো ঠাণ্ডা মাথায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আমরা যখন রেগে যাই তখন পূর্বাপর চিন্তা না করেই উদ্ভট কিছু বলে ফেলি বা করে ফেলি। এর মাশুল গুনতে হয় পরে অনুশোচনা করে বা সুযোগ হাতছাড়া করে। নিজের জীবন অনুসন্ধান করলে হয়তো দেখতে পাবো আমাদের জীবনের অনেক সুযোগ নষ্টের পেছনে রয়েছে এই রাগ ও ক্রোধ। সাফল্যের অন্তরায় হিসেবে রাগ ও ক্রোধকে সাফল্য পাওয়া শ্রেষ্ঠ মানুষেরা সবসময়ই শনাক্ত ও দায়ী করেছেন। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, রাগের মাথায় কিছু করলে তার ফল কখনই ভালো হয় না। কাজের ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ক্রোধ সংবরণ করতে হবে। আপনি যদি দায়িত্বশীল কিংবা কর্তব্যশীল হন তাহলে তা আরো বেশি জরুরি। কারণ অধস্তনকে পরিচালনা করতে গিয়ে রাগ কিংবা ক্রোধের কারণে আপনিই যদি পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেন তাহলে পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে আপনি যেই আস্থার জায়গায় অবস্থান করছেন তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ক্রোধ সংবরণ করা সম্পর্কে বিজ্ঞানময়গ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তারাই সংযমী যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় (অভাবের সময়) ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে

www.nagorikpathagar.org

আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই ভালোবাসেন" (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)।

রাগ-ক্রোধ পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে। পরিবারের সদস্য, বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী বা যেকোনো মানুষই একজন রাগী ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলতে চায় এবং তাকে কেউ পছন্দও করে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাগ-ক্রোধ লালনকারী ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কারণ রাগী ব্যক্তির সামনে কেউ মন খুলে কথা বলতে চায় না, এমনকি যুক্তিতর্কেও লিপ্ত হতে চায় না। এটা পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য ইতিবাচক নয়। যারা কর্তৃত্বশীল বা দায়িত্বশীল তারা রাগ এবং ক্রোধের মাধ্যমে সমাজ সংগঠন পরিচালনা করতে গেলে অধীনস্থরা আস্থা হারিয়ে আশপাশ থেকে সরে যায়, ফলে তা হিতে বিপরীত হয়, সৃষ্টি হয় সম্পর্কের টানাপড়েন। ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে তার বয়স, যোগ্যতা, পেশা, জ্ঞান, গরিমা, পারিবারিক শিক্ষা, সাংগঠনিক স্ট্যাটাস– সবকিছুর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তার রাগ বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম বা পথটি। এটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে চরমভাবে প্রভাবান্বিত করে। ক্রোধোন্মাদ ব্যক্তি বা রাগে পাগল বা অন্ধ হয়ে অপ্রকৃতিস্থ কাজকর্ম করে ফেলা মানুষটি নিজেকে যতই ভালোমানুষ দাবি করুন না কেন সমাজ, সংগঠন কিংবা পরিবারে তাকে সকলে একটু হলেও হেয় চোখেই দেখে থাকে। ব্যক্তি তার নিজের অজান্তেই আশপাশ মানুষের কাছে নেতিবাচক বা অপছন্দনীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

রাসূল (সা) সব মানুষকে আপন করেছিলেন রাগের পরিবর্তে কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়ায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "(হে রাসূল) আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় কঠোর-চিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদেরকে মাফ করুন আর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)। পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে রাগান্বিত হওয়ার একটা ঘটনা হাদিসে বর্ণিত আছে। সোলাইমান ইবন সুরাদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন দু'জন লোক পরস্পর গালমন্দ করছিল। তাদের একজন অপর জনকে এত রাগান্বিত হয়ে গালি দিচ্ছিল যে, তাদের একজনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী (সা) বললেন, আমি একটি কালেমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ত, তাহলে তার ক্রোধ চলে যেত। (তিনি বললেন) সে যদি 'আউজু বিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজিম' পড়তো। আমি শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। (বুখারি) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কুরআনে বলেন,

www.nagorikpathagar.org

"যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো উসকানি তোমাকে পায় তাহলে আউজু বিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজিম পড়ো" (সূরা হা-মিম সাজদা : ৩৬)।

অধিক রাগ মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে। এটি ব্যক্তিগঠন, আত্মশুদ্ধি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শৃঙ্খলা অর্জনের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায়। এটি একজন সত্যিকার মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে মন্ত্রণার অংশ হিসেবে। আপনাকে একটু রাগিয়ে দিতে পারলে, আপনার ক্রোধকে একটু উথলে দিতে পারলেই শয়তান দূর থেকে দেখে এই ভেবে হাসে যে, আপনাকে অন্তত সে বিপথে নেয়ার জন্য সফল হয়েছে। রাগ বা ক্রোধকে দমন করে সহনশীলতা, কোমলতা, ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারাটা ব্যক্তির এক মহৎ গুণ। রাগ বা ক্রোধ ধারণ করে কখন পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রন বা পরিবেশের শৃঙ্খল আনয়ণ করা যায় না। মহান আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকি লোকদের প্রশংসা করে তাদের গুণ তুলে ধরে বলেছেন, "(মুত্তাকিতো তারাই) যখন তারা ক্রোধান্বিত হয় তখন তারা মাফ করে দেয়" (সূরা শুয়া'রা : ৩৭)। অধিক রাগ মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে বলেই রাসূল (সা) রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন।

রাসূল (সা) বলেছেন, "ক্রোধের সর্বোচ্চ চিকিৎসা হলো অজু করা। কারণ রাগ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দ্বারা। আর আগুনকে পানি দিয়েই নিভানো যায়, শীতল করা যায়। তাই আমাদের কেউ যদি রাগান্বিত হয়ে পড়ে তখন যেন সে অজু করে নেয়" (আবু দাউদ)। রাগ নিয়ন্ত্রণের আরো একটি পদ্ধতি রাসূল (সা) বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমাদের কারো যখন রাগ আসে তখন সে দাঁড়ানো থাকলে যেন বসে পড়ে। এভাবে যদি তার রাগ প্রশমিত হয়ে যায় তাহলে ভালো। অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে" (আহমদ)। রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোক্ত কিছু পদ্ধতিও অনুসরণ করা যেতে পারে। রাগের উৎস থেকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরে থাকা। অযথা রেগে না গিয়ে চিন্তা করা কিভাবে সমস্যাটাকে সমাধান করা যায়। যার কারণে রাগ সৃষ্টি হয়ে দ্রোহের আগুন জ্বলছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া। এটা দু'জনের জন্যই ভালো ফল নিয়ে আসবে। যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করা যে রেগে গেলে শুধু নিজেরই ক্ষতি হবে, তার কোনো ক্ষতি হবে না। এতে আপনা আপনি রাগ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় রাগের আসল কারণ অন্তর্গত হীনম্মন্যতা। নিজের দুর্বলতাকেই মানুষ ঢাকার চেষ্টা করে দুর্ব্যবহার বা রাগারাগির মধ্য দিয়ে। তাই খুঁজে দেখুন আপনার মধ্যে কোনো হীনম্মন্যতা আছে কি না।

www.nagorikpathagar.org

রাগ বা ক্রোধ ঈমানের বড় শত্রু। আবার ক্রোধ যেমনিভাবে মানুষের ঈমান ও আত্মার শত্রু তেমনিভাবে অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ জীবনেরও বড় শত্রু। ক্রোধের কারণে মানুষের পশুসুলভ আত্মা সক্রিয় হয়। চেহারা বিবর্ণ হয়, মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যার কারণে অনায়াসে মুখে অশ্লীল কথা, অঙ্গে অশ্লীল ভঙ্গি প্রকাশ পায়। রাসূল (সা) বলেছেন, "ঈমান পূর্ণ করার চারটা আমল, যা কিছু মানুষকে দেবো আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য যা কিছু নেবো আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য। যাকে ভালোবাসব আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসব। যার প্রতি রাগ করব তাও আল্লাহকে খুশি করার জন্য" (তিরমিজি)। "যুদ্ধে তুমুল লড়াই চলছে। বীরকেশরী হজরত আলী (রা) কাফের এক সৈন্যকে কাবু করে তার বুকের ওপর চড়ে বসলেন। তরবারির আঘাতে যখনই তাকে হত্যা করতে যাবেন তখনই কাফের সৈন্যটি হজরত আলী (রা)-এর মুখে থুতু মারল। তৎক্ষণাৎ হজরত আলী (রা) তার বুকের ওপর থেকে সরে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। আশ্চর্য হয়ে কাফের জিজ্ঞাসা করল, হাতের মুঠোয় পেয়েও কেন তাকে হত্যা করা হলো না। হজরত আলী (রা) বললেন, আমি যখন তোমাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলাম তখন তা ছিল স্রেফ ইসলামের খাতিরে। কিন্তু যখন তুমি আমাকে থুতু নিক্ষেপ করলে তখন তোমার ব্যবহারে আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি। তখন তোমাকে হত্যা করা হলে তা আমার ক্রোধের কারণেই হত্যা করা হতো। তাই আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। আলীর এই মহানুভবতার কথায় সৈন্যটি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করল। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, "রাগ ঈমানকে এমনভাবে ধ্বংস করে যেমন পিপুল গাছের তিক্ত রস মধুকে বিনষ্ট করে" রাসূল (সা) আরো বলেছেন, "যে ক্রোধকে বাধা দেয় আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তার আজাবকে বাধা দেবেন" হজরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে আমার রাগ থেকে কিসে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, তুমি নিজে রাগান্বিত হয়ো না।

মানুষের জীবনে রাগ থাকতে পারবে না বিষয়টি কিন্তু এমন নয় বরং রাগ বা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এটিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা ছাড়া যার মধ্যে রাগ বলতে কিছু নেই তার মধ্যে তেজস্বিতাও নেই। রাগ বা ক্রোধ মানুষের মাঝে থাকবেই, তাকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করতে পারাই মূল সার্থকতা ও সফলতা। হাসতে সবাই পছন্দ করে। হাসা যেমন একটি মানবিক আচরণ, রাগ তার বিপরীত হলেও এটাকে অমানবিক আচরণ বলার সুযোগ নেই, এটিও মানবিক আচরণের মধ্যে পড়ে। বরং এটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তবে রাগ যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে ক্রোধে পরিণত হয় তখনই কেবল তাকে অমানবিক আচরণ বলা হয়ে থাকে। কারণ তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের মাঝে

www.nagorikpathagar.org

এমনও কেউ আছেন যারা কারণে অকারণে হঠাৎ রেগে যান। হঠাৎ রেগে যাওয়া একটি মানসিক সমস্যাও বটে। মানসিক সমস্যা বর্তমান আধুনিক সমাজের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। আমাদের সমাজ যত উন্নত হচ্ছে, মানসিক সমস্যার পরিমাণও তত বাড়ছে। রাগ এমন একটি মানসিক সমস্যা যা কারো কারো বেলায় প্রকট আকার ধারণ করে। তখন রাগকে শুধুমাত্র রাগ কিংবা ক্রোধের মধ্যেই চিহ্নিত করা যায় না, তখন সেটাকে পাগলামি হিসেবেই আমরা ধরে নিই। এই পাগলামি থেকে বেঁচে থাকার জন্যও আমাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ জরুরি। ক্রোধ যিনি দমন করতে পারেন, রাগ যিনি নিয়ন্ত্রণ করে চেপে যেতে পারেন, তিনিই আসলে প্রকৃত বীর। রাগ কিংবা ক্রোধ সংবরণ করতে পারা সহজ কোনো বিষয় নয়। এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারা বিজয়ী বীরের বীরত্বের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। হজরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি বীর নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করে বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে" (বোখারি ও মুসলিম)।

কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সবসময়ই কি রাগ না করে থাকা যায়? অথবা কেউ যদি বলেন, আমি না হয় রাগ না করে ক্রোধকে দমন করেই থাকলাম কিন্তু কেউ যদি আমাকে উদ্দেশ করে অহেতুক গালিগালাজ করে, মা-বাবা তুলে গালি দেয়, তখনও কি সত্যিই নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব? হ্যাঁ আসলেই সম্ভব! এরকম উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও রাগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকা যায়। ধরুন কেউ আপনার বিরুদ্ধে অহেতুক ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করল। আপনার বাবা-মা-বোনকে নিয়ে যাচ্ছেতাই বলল। আপনি চুপচাপ শুনে গেলেন, কিছুই বললেন না। অনেকক্ষণ গালিগালাজ করা ব্যক্তিটির কী অবস্থা হবে একটু ভাবুনতো। গালিবাজ লোকটি আপনাকে উত্তেজিত ও রাগান্বিত করতে চেয়েছিল। সে চাইছিল আপনার মাঝে ক্রোধের বিচ্ছুরণ ঘটুক। কিন্তু আপনি কিছুই বললেন না। ফলে তার উদ্দেশ্যই নস্যাৎ হয়ে গেল। সে আপনাকে যে গালিগুলো দিলো আপনি তার কিছুই নিলেন না, গায়েও মাখলেন না। ফলে তার নোংরা গালিগুলো তার দিকেই ফিরে গেল, তার গায়ে মাখামাখি হয়ে তার কাছেই থাকল। বস্তুত আপনার মা-বাবা-বোনকে গালি দিয়ে সে নিজেকেই অপমানিত করল। সে গালিগালাজ করে আপনার শান্তি নষ্ট করতে এসেছিল, আপনি গালির জবাব দেয়ার অর্থই হচ্ছে তার উদ্দেশ্যকে সফল করা। তারচেয়ে কিছুক্ষণ তার গালিগালাজ শোনার পর আপনি যদি বিনয়ের সাথে বলেন, ভাই আপনি অনেক দয়ালু। অনেক পরিশ্রম করে কিছু আমাকে দিলেন। কিন্তু এগুলো রাখার কোনো জায়গা আমার কাছে নেই। আমি কিছুই নিলাম না। এগুলো আপনারই থাক এ কথা বলার পর দেখবেন, গালিবাজটি দাঁত কামড়ে চলে

www.nagorikpathagar.org

যাচ্ছে। তার গালিগালাজ যে আপনার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারলো না, এটাই তার পরাজয়। আর এ পরাজয়ের যন্ত্রণা হয়তো অনেক দিন সে বয়ে বেড়াবে। সে এসেছিল আপনার শান্তি নষ্ট করতে, কিন্তু শান্ত থেকে ক্রোধ দমন করে আপনি তাকেই পরাভূত করলেন। রাগের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকতে হজরত আলী (রা) নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাগান্বিত অবস্থায় চারটি কাজ থেকে বিরত থাকো : ১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ২. শপথ গ্রহণ ৩. শাস্তি প্রদান ও ৪. আদেশ প্রদান।

রাগ করে কি আসলে কোনো উদ্দেশ্য হাসিল হয়? না হয় না। বরং কিছু কৌশল অবলম্বন করলে রাগ থেকেও বাঁচা যায়, উদ্দেশ্যও হাসিল হয় এবং সফলতাও ধরা দেয়। যেমন কেউ যদি আপনাকে ঠকানোর চেষ্টা করে। রেগে না গিয়ে ঘটনা থেকে আপনি শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যান। আপনার ওপর যদি অন্যায় অবিচার করে। মনে রাখুন, একা প্রতিবাদ করা অর্থহীন। সকলের অন্যায়ের মুখে দুর্বল এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অন্যায়ের প্রতিকার করার মতো শক্তি এবং সঙ্ঘবদ্ধতা অর্জন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, ধৈর্য ধারণ করুন। কোনো কাজের স্বীকৃতি না পেলে স্বীকৃতির প্রত্যাশা না করে কাজ করে যান। কাজই তার প্রতিদান দেবে। বিদ্রূপ করলে, রেগে গিয়ে আপনি কি তার উদ্দেশ্যকেই সার্থক করছেন না? নিজের নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে তুলে দিয়ে কেন হাসির পাত্র হবেন? উল্টো আপনি স্বাভাবিক থাকুন, স্মিত হাসুন। সে ভড়কে যাবে। মানসিক চাপ থাকলে, রেগে গেলে চাপ বাড়বে বৈ কমবে না। তাতে কাজের মান আরো খারাপ হবে। সময় লাগবে বেশি। বরং এই চাপকে দেখুন সুযোগ হিসেবে নিজের দক্ষতাকে আরো বাড়িয়ে নেয়া এবং আরো যোগ্য হওয়ার জন্য। পরিস্থিতি নাজুক হলে আসল কৌশল হলো মাথা ঠাণ্ডা রাখা। পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা। আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করলে, যৌক্তিক জবাব তুলে ধরুন। যুক্তিসঙ্গত কথা বুঝতে না চাইলে, উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন। যে ভাষায় বললে অপরপক্ষ বুঝবে তাকে সে ভাষায়ই বোঝান। প্রয়োজনে সময় নিন।

৩. অভিমান, অভিযোগ নয় সহানুভূতির দৃষ্টি প্রসারিত করুন

মানুষ একা চলতে পারে না। সামাজিক জীব হিসেবে জীবন পরিচালনায় মানুষকে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়। সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হলেও গড়ে তুলতে হয় পারস্পরিক সেতুবন্ধ। ব্যক্তিগতভাবেও সফলতার জন্য মানুষকে একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াতে হয়। যেকোন ক্ষেত্রে বসবাসরত মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা তাদের যে কোন সাফল্য অর্জন পথে সহায়ক হয়।

www.nagorikpathagar.org

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা মানুষের একটি বিশাল শক্তি। এই শক্তি সকল বাধাকে তুচ্ছ করে সাফল্য ছিনিয়ে আনতে মানুষকে সহায়তা করে। মানুষের এই পারস্পরিক সেতুবন্ধন তথা শক্তিশালী সম্পর্কের মাঝেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে ফাটল দেখা দেয়, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সম্পর্কের চিড় ধরে। ফলে মানুষ ঐক্যবদ্ধ সেতুবন্ধনের পরিবর্তে পারস্পরিক কিংবা দলগত বিভেদে জড়িয়ে পড়ে, একতা শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করে। সাফল্য ছিনিয়ে আনার পরিবর্তে বিভাজন ডেকে আনে। কিছু অর্জনের পরিবর্তে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবর্তে পরস্পরের মাঝে বিভেদ বিভাজনের দেয়াল তৈরি হয়।

সেতুবন্ধনের পরিবর্তে পারস্পরিক বিভেদ বিভাজনের দেয়াল তৈরিতে যে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার মধ্যে অন্যতম হলো অভিমান কিংবা অভিযোগ দাঁড় করানো। পারস্পরিক কথাবার্তা, চলাফেরা, লেনদেন, আচার-আচরণ এবং আনুগত্যে যখন অভিমান কিংবা অভিযোগ একে অপরের প্রতি দাঁড় করানো শুরু হয়ে যায় তখন সেখানে সহনশীল ও সহানুভূতির পরিবেশের পরিবর্তে একটি অসহনশীল পরিবেশ তৈরি হয়। ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। বিভেদ ও বিভাজনের নানা উপসর্গও নতুন নতুন করে তৈরি হয়। সম্প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবর্তে হিংসা ও বিদ্বেষ স্থান করে নেয়। আনুগত্যপরায়ণতার পরিবর্তে আনুগত্যহীন আচরণ শুরু হয়ে যায়। গিবত বা পরনিন্দার চর্চাও শুরু হয়ে যায়। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধনে সামগ্রিক এক বিপর্যয় নেমে আসে।

পারস্পরিক সম্পর্কের বিপর্যয় শুরু হয় কিন্তু সামান্য ভুল দিয়ে, তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে। মানুষ যখন কাজ করে তখন কাজের সময় মানুষের ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। ভুল-ভ্রান্তি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিক হলো, কাজের সময় ঘটে যাওয়া ছোটখাটো ভুল কিংবা ভ্রান্তিগুলোকে স্বাভাবিকভাবে না নেয়া। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা তার সহকর্মী কিংবা অধস্তনের ছোটখাটো ভুলগুলোকেও একদম সহ্য করতে পারেন না। এ ধরনের মানসিকতা কখনোই কাজের সুশৃঙ্খল পরিবেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। বরং অন্যের ভুল-ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতাকে সহনশীল ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখাই কল্যাণকর। ভুলগুলোকে ক্ষমা করে সংশোধনের সুযোগ করে দেয়ার মাঝেই রয়েছে বিশাল মহত্ত্ব। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং সংশোধন করে নেয়, তার বিনিময় আল্লাহর নিকট রয়েছে” (সূরা শুরা : ৪০)। হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “যখন কোন ব্যক্তি তার অপরাধের জন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, যদি সে ক্ষমা না করে অথবা গ্রহণ না করে তাহলে তার অপরাধ অত্যাচারী কর আদায়কারীর মতো” (বায়হাকি)।

www.nagorikpathagar.org

অভিমান, অভিযোগ পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পথ তৈরি করে। হিংসা-বিদ্বেষ আর শত্রুতা বাড়ায়। সহনশীল আর সহানুভূতির দৃষ্টিই পারে এসব কিছু থেকে পরস্পরকে রক্ষা করতে। এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (সা) এবং তার সাহাবাদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতির দৃষ্টান্তই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর রাসূল (সা) এবং তার সাথীরা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু পরস্পরের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহশীল" (সূরা ফাতাহ : ৩৯)। অপর একটি আয়াতে এসেছে, "তারা মু'মিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর" (সূরা মায়েদা : ৫৪)। আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন যারা সামান্য অভিমান কিংবা তুচ্ছ অভিযোগকে লালন করতে করতে তা হিংসা কিংবা বিদ্বেষে রূপান্তরিত করেন, যা আপন ভাইকেও সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, নবী করীম (সা) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করো না, দেখা-সাক্ষাৎ বর্জন করো না এবং সম্পর্ক ছিন্ন করো না, আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে বসবাস কর, কোন মুসলমান তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি বিচ্ছিন্ন থাকা বৈধ নয়" (বুখারি ও মুসলিম)। কুরআনে এসেছে, "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব ভাইদের সম্পর্ক পুনর্গঠিত করে দাও" (সূরা হুজুরাত : ১০)।

অভিমান, অভিযোগের পরিবর্তে মানুষ মানুষের জন্য ক্ষমা, দয়া, সহনশীল এবং সহানুভূতিশীল হবে এটি সৎপ্রবৃত্তির নান্দনিক দিক। মুসলিম চরিত্রের নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ তো এমনই হওয়া উচিত। রাসূল (সা) বলেছেন, "সেই প্রকৃত মুসলিম যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করে" কেউ যেমন নিজের সাফল্যের জন্য অন্যের সহযোগিতা চাইবে তেমনি অপরের সাফল্যের জন্যও তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে। কারণ ব্যক্তিগত সফলতার জন্যও একে অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন। পরস্পর সহযোগিতা না থাকলে কেউ কোন দিন সাফল্য অর্জন করতে পারে না, সমাজও লাভবান হতে পারে না। সহনশীলতা ও সহানুভূতি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ। যিনি ভদ্র, মর্যাদাবান তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ হবেন এটাই স্বাভাবিক। তিনি অন্যের মন জয় করতে চান তারতো সহনশীল আচরণ না করে উপায় নেই। সহনশীলতা ও সহানুভূতি যারা দেখাতে পারে না তাদেরকে সফল ব্যক্তিত্ব কিংবা মর্যাদাবান মানুষ বলার কোনো সুযোগ নেই। আমরা যদি পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি তাহলে সমাজ থেকে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট দূর হয়ে যাবে। প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই, সুতরাং প্রত্যেকের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এটি মূল প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদিসে রাসূল

www.nagorikpathagar.org

(সা) বলেছেন, "মুসলমান পরস্পর ভাই, সুতরাং সে তার ভাইয়ের ওপরে কোন প্রকার জুলুমও করতে পারে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায়ও ফেলতে পারে না। আর যে তার মুসলমান ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ্ তার অভাব পূরণ করবেন। অনুরূপভাবে যে কোন মুসলমানের দুঃখ দূর করে দিবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ত্রুটি গোপন করে রাখবে, আল্লাহ্ হাশরের দিন তার ত্রুটিও গোপন করে রাখবেন" (বোখারি ও মুসলিম)।

অপর ভাইয়ের ত্রুটি তাকেই সংস্কারের উদ্দেশ্যে ধরিয়ে না দিয়ে কিংবা গোপন না রেখে তার অগোচরে বলে বেড়ানোই গিবত। গিবত পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিকে ধ্বংস করে সামাজিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে নষ্ট করে তোলে। অভিমান, অভিযোগের জায়গা থেকেই গিবতের জন্ম নেয়। সহানুভূতির পরিবেশ নষ্ট করে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, "গিবত হলো ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) গিবত কি করে ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক? হুজুর (সা) বললেন, কোন ব্যক্তি জেনা করার পর যখন তওবা করে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। কিন্তু গিবতকারীকে যার গিবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে আল্লাহ্ মাফ করবেন না" (বায়হাকি ও মেশকাত)। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সা) বললেন, "গিবত হলো তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অনুপস্থিতিতেই) এমনভাবে করবে যে, সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর হুজুর (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো– হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি যা কিছু বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রেও কি গিবত হবে? হুজুর (সা) জবাব দিলেন, "তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলেও সেটা গিবত হবে। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে তা হবে বোহতান "(মুসলিম)। আর বোহতান করা মারাত্মক অপরাধ। অপর হাদিসে এসেছে একের কথা অপরের কাছে বলে বেড়ানো হচ্ছে চোগলখুরি আর রাসূল (সা) এ জঘন্য পাপটি পরিহার করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, চোগলখোর বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না।

অভিযোগ সমালোচনা করলে এগুলো ব্যক্তির আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, কখনো কারোর সমালোচনা করা যাবে না, কিংবা অভিযোগ করা যাবে না। বিষয়টি আসলে তা নয় বরং এহতেসাব তথা সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনার পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধতা করা যেতে পারে। অভিযোগ কিংবা সমালোচনা হবে সংশোধন করার দৃষ্টিভঙ্গিতে, হেয় কিংবা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে

www.nagorikpathagar.org

নয়। অভিযোগের পাশাপাশি ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি ও সহনশীলতার দৃষ্টিও রাখতে হবে। জনসম্মুখে অভিযোগ না দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। ভালো কাজের প্রশংসা করে সমাধানের পথ খুঁজে পেতে নিজ থেকেই যথাযথ সহযোগিতার হাত আন্তরিকভাবে বাড়িয়ে দিতে হবে। কিছু লোক আছে যাদের স্বভাবই হলো শুধুই অভিযোগ করা, প্রতিটি দিনকেই তারা সমস্যাগ্রস্ত দেখেন, প্রতিটি মানুষকেই তারা কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান। অথচ অভিযোগের ভালো পদ্ধতি হচ্ছে অভিযুক্তকে সংশোধন করার নিয়্যাতে সুযোগ দেয়া, নিজের আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটানো। ইমাম রাযী বলেছেন, "ক্ষমা করে দেয়াটাই সর্বোত্তম প্রতিশোধ। অভিমান অভিযোগের পরিবর্তে একে অপরের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি প্রসারিত করা কর্তব্য। কারণ বোকা ও দুর্বলরাই অভিমান এবং অভিযোগ করে, এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান হওয়াই শ্রেয়"

৪. সদা হাস্যোজ্জ্বল থেকে আচরণে আন্তরিক হোন

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব হিসেবেই প্রতিনিয়ত তাকে সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে চলতে ফিরতে হয়, কথা বলতে হয়। এটি মানুষের জীবনাচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গুরুত্বপূর্ণ এ অধ্যায়ে, শুধুমাত্র আচরণের কারণেই একজন আরেকজনের বন্ধু হয়, একজন আরেকজনের শত্রু হয়, একজন আরেকজনকে কাছে টেনে নেয়, একজন আরেকজনকে দূরে ঠেলে দেয়। আচরণের এই ভিন্নতার কারণেই মানুষের পরিচয়ও ভিন্নভাবে ফুটে ওঠে। ফুটে ওঠে মানুষের রুচিবোধের বৈশিষ্ট্য। মানুষ যা করে তা করতে গিয়ে যদি ভদ্র, মার্জিত ও সুন্দর আচরণের আশ্রয় নেয় তবে তাতেই বিকশিত হয় তার রুচিবোধ। কারণ, মানুষের আচরণই তার অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ, মানুষের মধ্যে কে ভালো, কে মন্দ তা নির্ভর করে তার অন্তরের অনুভূতি থেকে প্রকাশিতব্য আচরণের ওপর।
আমার আর আপনার মূল পরিচয় শুধুমাত্র বাহ্যিক আচরণে ফুটে ওঠে না, এটা হয়তো সাময়িক কোনো খ্যাতি দিতে পারে। কিন্তু আমার আপনার ভেতরকার মানুষটির প্রকৃত আচরণই মূল পরিচয় বহন করে। সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মহামানব রাসূল (সা) তার বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, "আত্তাকওয়া হাহুনা" অর্থাৎ মুত্তাকির পরিচয় এখানে (অন্তরে), তার বাহ্যিক চাল-চলন বা আচরণে নয় বরং তার ভেতরকার বিষয় ফুটে ওঠার মাধ্যমে প্রকাশ হয়।

মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আচরণগত দিকের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকার মাধ্যমে। যিনি সদা হাস্যোজ্জ্বল থেকে আচরণে আন্তরিক হতে পারেন তিনিই সবার হৃদয় জয় করতে পারেন, সবাইকে কাছে টানতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

আচরণের সাথে সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। একজন দায়িত্বশীল মানুষ তার অধীনস্থদের কাছে টানার ক্ষেত্রে কতটুকু সফল হবেন তা নির্ভর করবে তার সদা হাস্যোজ্জ্বল আচরণের ওপর। সদা হাস্যোজ্জ্বল থেকে যদি আচরণে আন্তরিক হওয়া যায় তাহলে সবার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব এবং সবাইকে কাছে টানাও সম্ভব। যিনি সবাইকে কাছে টানতে পারেন তিনি সহজেই সবার প্রিয়ভাজন হতে পারেন।

মানুষ স্বীয় চরিত্রে পরস্পরকে আপন করে নেয়। সদগুণাবলি অলঙ্কারস্বরূপ। নিজের মাঝে লুকিয়ে থাকা সদগুণাবলিগুলোকে সদা হাস্যোজ্জ্বল থেকে আচরণে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত। কারণ, সদালাপ, সদগুণাবলি বিকাশেই কল্যাণ নিহিত। বদগুণাবলি তথা বদঅভ্যাস বিকাশে কোনো গৌরব নেই। কারো সাথে যখন সাক্ষাৎ হয় এবং কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয় তখন হাস্যোজ্জ্বল থেকে আন্তরিকভাবে কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। সাক্ষাৎদাতা এবং সাক্ষাৎপ্রত্যাশী উভয়েই আন্তরিক সম্ভাষণ কামনা করেন। আন্তরিক সম্ভাষণ আর হাসিমুখে কথা বলা অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়। সাক্ষাৎকে ফলপ্রসূ করতে হলে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, তা হলো সাক্ষাতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে হাসিমুখে আন্তরিকতা বিনিময় করা।

কথার যেমন মূল্য আছে তেমনি কথার মাধ্যমে মানুষের যে আচরণ প্রকাশ পায় তার মূল্যও অনেক বেশি। কারণ যথার্থ আচরণ ছাড়া মূল্যবান কথাও অর্থহীন হয়ে যায়। একজনের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে গিয়ে যদি গুরুত্বহীন তথা মূল্যহীন ও অমূলক আচরণ করা হয় তখন গুরুত্বপূর্ণ কথাটাই বলার আর সুযোগ থাকে না। বাচালতা, মিথ্যা আর মলিনতার আশ্রয় নিয়ে কথা বলার চেয়ে চুপ থাকাই ভালো। যারা এসবের আশ্রয় নেয় তারা রাসূল (সা) এর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত হিসেবে বিবেচিত হন। এ প্রসঙ্গে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যেসব লোক বাচাল, দুর্বোধ্য ভাষায় এবং অহঙ্কারের সাথে কথা বলে তারা আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন তারা আমার থেকে অনেক দূরে থাকবে" (তিরমিজি)।

অসহিষ্ণু হয়ে কথা বলা, প্রশ্নের উত্তর দেয়া, সামান্য কারণেই তেতে ওঠা এসবই সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা ও আন্তরিকতার বিপরীত। এগুলো সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। কারণ, এতে পারস্পরিক আস্থা ও সম্পর্কের ভিত নড়বড়ে করে দেয়। সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশকেও মুহূর্তে বিশৃঙ্খল করে দেয়। সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়

www.nagorikpathagar.org

কথা বলতে পারাটা মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে। ভদ্রতার পরিবেশ বজায় রাখে। বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে কথা কিংবা গালি শোনা মাত্রই উগ্র হয়ে ওঠা কিংবা ক্রোধ নিয়ে জবাব দেয়ার মধ্যে কোনো সফলতা নেই। সামান্য একটু অপমান কিংবা অবহেলায় উত্তপ্ত না হয়ে একটু অপেক্ষা করা, ধৈর্য ধারণ করা উচিত। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা ফুরকানের ৬ নম্বর আয়াতে বলেন, আর তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম (তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

যদি কারো সাথে বিতর্কও করতে হয় তবে তা করতে হবে উত্তম পন্থায়। কেননা মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই যারা উত্তম পন্থা অবলম্বন করে। সূরা নাহলের ১২৫ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়" তর্ক করার অর্থ হলো হেরে যাওয়া যুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। তর্কে আসলে জেতা যায় না শুধু মনের তুষ্টি অর্জন করা যায়। এখানে জিতলেও আপনি হারবেন আর হারলে তো কথাই নেই। যত তর্কে জিতবেন তত আপনার কাছ থেকে লোক দূরে সরে যাবে, দিন দিন আপনি বন্ধু হারাবেন। সূরা আনকাবুতের ৪৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা সুন্দর পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না" মুজাদ্দেদ-ই-আল ফেসানি (রহ্) বলেছেন, "ভালো কথা বন্ধুদের পর্যন্ত পৌছাতে চেষ্টা কর। বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ো না" সূরা লোকমানের ১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আর লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না" মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল (সা)-এর আচরণেও ছিল বদমেজাজ ও কাঠিন্যতা পরিহার। তাইতো তিনি সবাইকে কাছে টেনে নিয়েছেন, আপন করে নিতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ করে বলেন, "আল্লাহ্র রহমতেই আপনি তাদের জন্য নরম দিল ও সুহৃদয় হয়েছেন। যদি বদমেজাজি ও কঠিন হৃদয়ের হতেন তবে লোকেরা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো"

অনেক সময় আপনার আমার অহঙ্কার আর আত্মম্ভরিতাপূর্ণ আচরণের কারণে লোকেরা দূরে সরে যায়। আপনার জ্ঞান-গরিমা, সম্মান-মর্যাদা, বুদ্ধি-বিবেক বেশি বলে নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করবেন তা হতে পারে না। বরং তা আপনাকে আরো ছোট করে তুলবে। মেধাহীন দুর্বলের সাথে রূঢ় আচরণ করবেন তা হতে পারে না বরং সেটা আপনার অর্জনকে ধ্বংস করে দেবে। আপনি বড় মানুষ বলে অন্যের সাথে 'দেমাগ' দেখিয়ে কথা বলবেন, নিজেকে অন্য উচ্চতায় রাখার চেষ্টা করবেন! এমন হলে আপনার কাছ থেকে সবাই দূরে সরে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞান-গরিমাই সবকিছু নয় বরং আচরণ দেখেই বোঝা যায় ব্যক্তিটি কতটা সম্মানিত আর কতটা সুন্দর মনের অধিকারী। হাদিসে এসেছে, একবার হযরত জাবির ইবনে সুলাইম (রা) রাসূল (সা)-এর কাছে উপদেশ চাইলে রাসূল (সা) বললেন– কাউকে কখনো গালিগালাজ করো না। জাবির বলেন, এরপর আমি কখনো আজাদ, গোলাম এমনকি উট, বকরিকেও গালি দেইনি। রাসূল (সা) আরো বললেন– ভালো ও নেকির কোনো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করো না, তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলবে, প্রতিদিনের ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট ব্যবহার, একটুখানি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণে ব্যক্তির মর্যাদা, মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

যিনি তার জীবনের পথচলায় মিথ্যা কথা, নিষ্ঠুর বাক্য ও প্রতারণা থেকে মুক্ত থেকে অন্যের সাথে আচরণ করতে পারেন তার জীবনটা সত্যিই সার্থকজীবন। হাস্যোজ্জ্বল আচরণে যদি আপনি দোষশূন্য নির্মল ও মহৎ আচরণ করেন তাহলে দেখবেন দুরাচার, দুষ্ট লোকও লজ্জায় আপনার সামনে বিনয়ী থাকবে। যিনি এমন উত্তম গুণের অধিকারী তার পক্ষেই সমাজ সংগঠনে পরিবারে সকল পথের মানুষকে নিয়ে নির্মল সুন্দর একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ উপহার দেয়া সম্ভব।

যখন মনে যা আসে তাই না বলে কথায়, কাজে, ব্যবহারে, শব্দ চয়নে কৌশলী হওয়া প্রয়োজন। কখন কী বলা দরকার, কতটা বলা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা আবশ্যক। কী বলতে হবে, কী না বললে ভালো হয় তাও আগেই অনুধাবন করা প্রয়োজন, এমন কথা পরিহার করা উচিত যা মানুষকে আঘাত দেয়। তিক্ত মনোভাব নিয়ে কথা বললে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ, কথা একবার বলে অপরের মনে আঘাত দিয়ে ফেললে তা আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না।

হাসিমুখে কথা বলে আন্তরিক আচরণ দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জে উত্তীর্ণ হতে পারাই সার্থকতা। সদা হাস্যোজ্জ্বল থেকে আচরণে আন্তরিক হওয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র অন্যের হৃদয় জয় করাই হয় না, শুধুমাত্র মানুষকে কাছে টানাই হয় না, বরং এটি একটি ইবাদতও বটে। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) বলেছেন– মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলাটাও একটা ইবাদত। আলী (রা) আরো বলেন– মুমিনের চেহারায় প্রস্ফুটিত থাকে একটি হাস্যোজ্জ্বল আনন্দের রেখা। দুঃখ সমাহিত থাকে তার অন্তরের গভীরে, তার আত্মা হয় প্রশস্ত। জীবনে সফলতা পাওয়ার জন্য সকলেরই উচিত সদা হাস্যোজ্জ্বল থেকে আচরণে আন্তরিক হওয়া।

www.nagorikpathagar.org

নির্ভরতা

১. প্রতিদিনের কর্মের আত্মপর্যালোচনা করুন

সাফল্যের পেছনে ছুটে চলা প্রতিটি মানুষই জানেন সাফল্য এমন এক জিনিস যাকে অর্জন করতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ব্যাপক লড়াই-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। যারা লড়াই-সংগ্রাম করে প্রতিনিয়ত সাফল্য ছিনিয়ে আনেন তারা শুধু লড়াই-সংগ্রাম করেই যে সাফল্য ছিনিয়ে আনেন তা কিন্তু নয় বরং তারা প্রতিদিন তাদের নিজ নিজ কর্মের পর্যালোচনা করেন। কারণ সাফল্য অর্জনে প্রতিদিনের কর্মের আত্মপর্যালোচনার বিকল্প নেই। আত্মপর্যালোচনা না করে সাফল্য কিংবা ভালো কিছু অর্জনের আশা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস রয়েছে, আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে তার নফসের প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ তথা আত্মপর্যালোচনা করে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য (নেক) কাজ করে। আর দুর্বল সে ব্যক্তি, যে স্বীয় নফসের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আবার আল্লাহর কাছেও (ভালো কিছু প্রাপ্তির) আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে" (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ)।

নিজেকে নিজেই মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়ার নাম আত্মপর্যালোচনা। আরবিতে এটাকে বলা হয় 'মুহাসাবা'। আর ইংরেজিতে বলে **Self-evaluation**। ইংরেজিতে আত্মপর্যালোচনাকে **Time for review** নামেও অভিহিত করা হয়। আত্মপর্যালোচনা হচ্ছে নিজের কাজের হিসাব নিজেই নেয়া। এটি নিজের সাথে নিজের প্রতিযোগিতাও বটে। গতকাল আমি কতটুকু কাজ করতে পেরেছি আর

www.nagorikpathagar.org

আজকে আমি কতটুকু করতে পারলাম। আজকে যতটুকু কাজ করার পরিকল্পনা আমার ছিল তার কতটুকু আমি করতে পেরেছি। আমার কাজের মধ্যে কোনো ভুল-ত্রুটি ছিল কি না, কোনো দুর্বলতা ছিল কি না। আমার আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে ভালো হলো কি না সেসব বিষয়ের পর্যালোচনা করা। কারণ ধ্বংসের পরিবর্তে সফলতাতো তার জন্য যার আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে ভালো হলো। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস রয়েছে, মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল (সা) বলেছেন, "ধ্বংস তার জন্য, যার আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে উত্তম হলো না" আত্মপর্যালোচনা শুধুমাত্র গতকালের হিসাব-নিকাশ তথা অতীতকেই যাচাই করে না বরং তা আমাদেরকে অতীত এবং আজকের অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী প্রস্তুতির নির্দেশনাও দেয়। যেমন বলা হয়েছে, **self-evaluation directs us to prepare our next performance from the past and today's experiences.**

পরবর্তী প্রস্তুতির নির্দেশনা পেতে নিজের কর্মের পর্যালোচনা নিজে করার মাঝে অনেক সার্থকতা আছে। ব্যক্তি নিজেই যদি নিজের কাজের হিসাব নিতে পারে তাহলে তা তার সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি তাকে সহযোগিতা করে। অন্য কেউ তার কাজের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার আগেই নিজের ত্রুটিগুলো নিজে চিহ্নিত করতে পারলে কর্মক্ষেত্রে সমালোচনার হাত থেকে বাঁচা যায়, জবাবদিহিতা সহজ হয়, অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। একটি শ্লোগান রয়েছে "নিজের হিসাব নিজেই করি : প্রতিদান দিবসের হিসাবকে সহজ করি" প্রতিদান দিবসে তথা কাল কেয়ামতের ময়দানে প্রতিটি আদম সন্তানকে তার নিজের কর্মের হিসাব নিজেকেই পেশ করতে বলা হবে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, "পড় তোমার কিতাব (আমলনামা), আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট" (সূরা বনি ইসরাইল : ১৮)। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমাদের কাছে হিসাব চাওয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের হিসাব সম্পন্ন করে নাও, তোমাদেরকে পরিমাপ করার আগেই তোমরাই নিজেদেরকে পরিমাপ করে নাও। কিয়ামত দিবসে পেশ হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করো। সুসজ্জিত হও সেদিনের জন্য, যেদিন তোমাদের সামনে কোনো কিছু অস্পষ্ট থাকবে না" (তিরমিজি)।

আমি যদি আজকেই আমার হিসাবটা নিয়ে নিতে পারি তাহলে পরবর্তী দিবসে জবাবদিহিতা করা আমার জন্য সহজ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আমরা এমন

www.nagorikpathagar.org

অনেক কাজ করি যার জন্য কারো কাছেই জবাবদিহি করতে হয় না। অথবা যিনি আমার কাছ থেকে আমার কাজের জবাবদিহিতা নেবেন তিনি কোনো কারণে জবাবদিহি করেন না এমনকি কিছু বলেনও না। অথচ আমরা জানি, যে কোন কাজে জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জবাবদিহিতা ছাড়া কাজের শতভাগ সাফল্য আশা করা যায় না। এক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নেয়ার চমৎকার এবং তাৎপর্যপূর্ণ মাধ্যম হলো আত্মপর্যালোচনা। অর্থাৎ নিজের কর্মের পর্যালোচনা নিজে করে নেয়া। এতে কাজ কতটুকু হলো কতটুকু বাকি থাকল, কাজের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি হলো কি না, সময়ের কাজ সময়েই সম্পন্ন হলো কি না, নিজের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় হলো কি না তা নিজে নিজেই পরিমাপ করার পাশাপাশি সফলতা অর্জনও নিশ্চিত করা যায়। দুনিয়াবি সফলতার পাশাপাশি পরকালীন সফলতা অর্জনে আত্মপর্যালোচনার বিকল্প নেই। কারণ উভয় জিন্দেগির সফলতা অর্জনে মুত্তাকি বা আল্লাহভীরু হওয়া প্রয়োজন। আর মুত্তাকি হতে হলেও প্রয়োজন আত্মপর্যালোচনার। মায়মুন ইবন মিহ্‌রান (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "সে অবধি কোনো ব্যক্তি মুত্তাকি বা আল্লাহভীরু হতে পারবে না যে যাবৎ না সে নিজেই নিজের হিসাব নেয় বা মুহাসাবা করে। যেভাবে সে তার সঙ্গীর সঙ্গে হিসাব করে কোথায় তার আহার আর কোথায় তার পোশাক" (তিরমিজি)।

প্রতিদিনের কর্মের আত্মপর্যালোচনার কিছু পদ্ধতিও রয়েছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পদ্ধতিটি ইমাম গাযযালী (রহ) নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম কাজ হলো, 'সকালে ঘুম থেকে জেগে নফসের কাছে এ মর্মে অঙ্গীকার করা যে, আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো খারাপ কাজ করব না। আমার ওপর দায়িত্ব যত আছে সব ঠিকমতো আদায় করব। আমার ওপর আল্লাহর যত হক আছে, বান্দার যত হক আছে সব পুরোপুরি আদায় করব। হে নফস! মনে রেখ, ভুলক্রমে অঙ্গীকারের বিপরীত কোনো কাজ করলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।' পাশাপাশি এ অঙ্গীকার অনুযায়ী কাজ করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করা। এই হলো প্রথম কাজ আর এর নাম দিয়েছেন তিনি 'মুশারাতা' বা 'আত্ম অঙ্গীকার'। দ্বিতীয় কাজটি হলো পুরো দিনের কাজের মাঝে সকালে কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না তা দেখা। মানুষ যখন জীবিকার জন্য কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে যায়, চাকরি করলে চাকরিতে, ব্যবসা করলে ব্যবসায়, দোকান করলে দোকানে, পড়াশোনা করলে ক্যাম্পাসে চলে যায়। সেখানে প্রতিটি কাজ শুরু করার আগে একটু ভেবে দেখা, এ কাজটি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কি না। এ আচরণ বা এ শব্দ যা উচ্চারণ করছি তা প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী কি না। যদি প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী মনে হয় তাহলে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা এবং সে কাজটি না করা।

www.nagorikpathagar.org

এটাকে তিনি বলেছেন 'মুরাকাবা'। তৃতীয় কাজটি করতে হবে শোয়ার আগে, আর তা হলো 'মুহাসাবা' অর্থাৎ আত্ম-পর্যালোচনা। নফসকে বলবে, তুমি সারাদিন খারাপ কাজ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। প্রতিটি কাজ সঠিকভাবে করবে। আল্লাহর হক ও বান্দার হক ঠিকমত আদায় করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। এখন বলো কোন কাজ তুমি প্রতিজ্ঞামত করেছ, আর কোন কাজ প্রতিজ্ঞামত করনি? এভাবে সারাদিনের সকল কাজের হিসাব গ্রহণ করা আত্মপর্যালোচনার উত্তম পদ্ধতি। আত্মপর্যালোচনার সঠিক পদ্ধতির পাশাপাশি তা করার জন্য একটি ভালো সময়ও বেছে নেয়া আবশ্যক। সঠিক সময় হচ্ছে শোয়ার পূর্বমুহূর্ত। এর চেয়ে ভালো সময় হচ্ছে ফজর নামাজের পর। সবচেয়ে ভালো সময় এশার নামাজের পর। অর্থাৎ এ সময়গুলো থেকে যে কোন একটি সময় আত্মপর্যালোচনার জন্য বাছাই করা যেতে পারে।

আত্মপর্যালোচনার সময় নিম্নোক্ত বিষয়ে আরো গভীরভাবে ভাবার সুযোগ রয়েছে। তাহলো, প্রথম পর্যায়ে আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে জায়নামাজে বসে মনে মনে এ চিন্তার উদ্রেক করা যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন। আমি সেই রাব্বুল আলামিনের সামনে বসে আছি; যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর হাতেই আমার জীবন ও মৃত্যু। তিনি রহমান, রহিম ও কাহ্হার। আমার অন্তরের নিভৃত কোণের খবরও তিনি রাখেন। মস্তিষ্ক দিয়ে আমি কি চিন্তা করছি তা তিনি ভালোভাবে জানেন। তিনি ইনসাফগার। আমার ওপর তিনি কখনও জুলুম করেন না। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজের সারাদিনের কর্মব্যস্ততা স্মরণ করা। যে সমস্ত ভালো কাজ করা হয়েছে তার জন্য শুকরিয়া আদায় করা এবং যা ভুল হয়েছে তার জন্য তওবা করা। তৃতীয় পর্যায়ে আজকের দিবসে আদায়কৃত ফরজ ওয়াজিবসমূহ নিয়ে চিন্তা করা। এসব আদায়কালে আন্তরিকতা এবং মনোযোগ যথার্থই ছিলো কি না ভেবে দেখা। চতুর্থ পর্যায়ে আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল তা পালন করেছি কি না? এজন্য আমার সময় ও সামর্থ্য যা ছিল তা পুরাপুরি ব্যয় করেছি কি না? পঞ্চম পর্যায়ে আজকের ব্যবহারিক জীবন (মুয়ামেলাত) সম্পর্কে চিন্তা করা। শেষ পর্যায়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

এভাবে প্রতিদিন কিছু সময় বের করে নিজের আত্মপর্যালোচনা করতে হবে। ভাবতে হবে সময়তো ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যে কাজটুকু করার আমি কি তা সম্পন্ন করতে পেরেছি? পরিকল্পনার কতটুকু কাজ করতে পারিনি অথচ আমার কতটুকু কাজ করার কথা ছিল। প্রচলিত একটি প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতি আছে, **'If you think each day the last day of your life, then one day you really will be successful'** অর্থাৎ "তুমি যদি প্রতিটি দিনকেই তোমার জীবনের শেষ

www.nagorikpathagar.org

দিন ভাব, তাহলে একদিন তুমি সত্যি সত্যিই সফল হবে" তাই প্রতিদিন ভোরে উঠেই আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত- আজকের দিনটাকে আমি সফল ও সার্থক করে তুলবো। আমার আজকের কাজ যেন কল্যাণের পথে হয়। প্রতিটি মুহূর্তেই যেন সত্য ও সুন্দরের সাথে অতিবাহিত হয়। আমাদের আত্মপর্যালোচনায় এ উপলব্ধি জাগ্রত হওয়া উচিত যে, প্রতিদিন কত পাপ, অন্যায় পঙ্কিলতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে অপবিত্র করে, আত্মাকে মলিন করে। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে আমরা কত না মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি। হিংসা, প্রতিহিংসা, কিংবা প্রতিশোধের কত বীজ আমরা প্রতিদিন বপন করি। এসব অকল্যাণের বিষয় নিজের পর্যালোচনায় নিয়ে এসে এসবের মধ্যে আর নিজেকে না জড়ানোর প্রতিশ্রুতি নেয়াটাই আমাদের পরবর্তী দিনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলবে আর কাজের মধ্যে গতিশীলতা এনে সাফল্যকে নাগালের মধ্যে এনে দেয়ার চেষ্টা করবে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, প্রকৃত কর্মী সেই ব্যক্তি যে দিবসের কাজ পরদিনের জন্য মুলতবি করে রাখে না। প্রতিটি দিনের, প্রতিটি কাজের অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে ভুল ভ্রান্তি দূর করে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে, "প্রত্যকেই (খতিয়ে) দেখা উচিত যে আগামী কালের (প্রতিদান দিবসের) জন্য সে কী প্রেরণ করেছে" (সূরা আল হাশর-১৮)।

কিছু নেতিবাচক কাজ পরিত্যাগ করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। বার বার করে ফেলি, অনুতপ্ত হই, কিন্তু আবার করি। নিজের ভেতরটাকে শোধরানোর চেষ্টা করি কিন্তু সফল হই না। এ ক্ষেত্রে আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমেই আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যতবার ভুল হবে, ততবারই চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য আমাদের প্রতিদিনের কর্মতৎপরতার আত্মপর্যালোচনাপত্র পূরণ করা আবশ্যক। প্রত্যেকদিন আত্মপর্যালোচনাপত্র নিজে পূরণ করে নিজের কাছে রাখা এবং নিজের হিসাব নিজেই যাচাই করা। নিজের সাথে নিজের প্রতিযোগিতা এই মর্মে করা যে, গতকাল আমি কতটুকু করতে পেরেছি আর আজকে আমি কতটুকু করতে পারলাম। এই আত্মপর্যালোচনা বা আত্মমূল্যায়নপত্র যদি নিয়মিত রাখা যায় তাহলে নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে এবং সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মপর্যালোচনা মানে নিজের কাছে নিজ কাজের সামগ্রিক খতিয়ান দেয়া। কোন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন নিজকর্মের পর্যালোচনা নিজে করেন তার জীবন ক্রমাগত উন্নত না হয়ে পারে না। কারণ এভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজের প্রতি আস্থা-নির্ভরতা এবং কনফিডেন্স তৈরি হয়। বিশেষ করে যারা আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে নিজ নিজ কাজের পর্যালোচনা করেন, তারা কোনো

www.nagorikpathagar.org

অবস্থাতেই তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য দেখাতে পারে না। আখেরাতের সাফল্য যাদের একমাত্র কাম্য, খোদার সন্তুষ্টির আশা এবং অসন্তোষের ভীতির মাঝপথে যারা দন্ডায়মান, তাদের জীবনে প্রতিদিনের কর্মের আত্ম-পর্যালোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নেয়া ভালো। আত্ম-পর্যালোচনার সময় নিজের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে যেন রোজ কেয়ামতে পরম পরাক্রমশালী হাকিমের সামনে নিজের কাজের (আমলের) পর্যালোচনা করা হচ্ছে। প্রতিদিনের কর্মের আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে একটি পরিশুদ্ধ ও সুন্দর জীবন গঠন করার প্রচেষ্টা চালানো আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত।

২. আল্লাহকে যারা বেসেছে ভালো দুঃখ কি আর তাদের থাকতে পারে

২০১৭ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে পাবনার সাঁথিয়ার মনমথপুরে শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ)-এর কবর জিয়ারত করে এলাম। জিয়ারত শেষে সেখানে রাখা সংরক্ষিত শোকবইয়ে কিছু কথা লিখেছিলাম। আবেগের তাড়নায় সেদিন শোকবইয়ে কী লিখেছি বাসায় বসে সে কথাগুলো ভাবছিলাম আর আমার মনের ভেতর থেকে একটি প্রেরণাদায়ক গান উচ্চারিত হচ্ছিল। আমাদের প্রেরণার জন্য অনেক গান রয়েছে, যেগুলো গুনগুন করে গেয়ে আমরা মনে প্রশান্তি পাই।

সেদিন বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার চৌধুরী গোলাম মাওলা রচিত 'আল্লাহকে যারা বেসেছে ভালো দুঃখ কি আর তাদের থাকতে পারে, হতাশা কি আর তাদের থাকতে পারে'– গানটি গুনগুন করে গাইছিলাম আর শহীদ মাওলানার শোকবইয়ে কী লিখেছি তা স্মরণ করার চেষ্টা করছিলাম। ভাবনায় গানের কথাগুলোর সাথে সংরক্ষিত শোকবইয়ে লেখা আমার কথাগুলোর মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম। সেদিন আবেগ দিয়ে যে কথাগুলো লিখেছিলাম বাস্তবে আমার মনে হচ্ছিল আমি যথার্থই লিখেছি। শোকবইয়ে আমি লিখেছিলাম– 'শহীদ মাওলানাকে আওয়ামী জুলুমবাজ সরকার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে জুডিশিয়াল কিলিংয়ের মাধ্যমে যে হত্যা করেছে, এটি আজ দেশ ও বিশ্ববাসীর কাছে দিবালোকের মতো স্প" আমরা ব্যথিত, ভারাক্রান্ত এবং শোকাহত। তবে স্পষ্ট বলে দিতে চাই, আমরা হতাশ নই। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে বাংলার এই সবুজ জমিনে একদিন কালেমার পতাকা পতপত করে উড়বে ইনশাআল্লাহ। সেই প্রত্যাশায় রইলাম ...।'

সেদিনের লেখা সংরক্ষিত শোকবইয়ের লাইনগুলো আর গানের কথাগুলো থেকে আমি হতাশার পরিবর্তে প্রেরণাদায়ক শক্তি খুঁজে পেলাম। দুঃখ-কষ্টকে লালনের

www.nagorikpathagar.org

পরিবর্তে দ্বীনবিজয়ের স্বপ্ন বুনার দীক্ষা পেলাম। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ব্যথিত, ভারাক্রান্ত এবং শোকাহত হওয়ার পাশাপাশি দুঃখ-কষ্ট ও হতাশাকে লালন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এবং সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যম ধৈর্য তা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারি না। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়, তাদের তোমরা মৃত বল না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা এবং জান, মাল ও ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব। (হে নবী!) আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। আর তারাই ধৈর্যশীল যারা বিপদের সময় বলে আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তারই দিকে ফিরে যাবো" (সূরা বাকারা : ১৫৩-১৫৬)। আল কুরআনে আল্লাহ আরো বলেন, "তোমরা হতাশ হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হয়ে থাকো" (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)। "আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করবো না কেন? তিনিই তো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়া দিচ্ছো আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা করব এবং যারা আল্লাহর ওপরই ভরসা করতে চায় তারা ভরসা করুক" (সূরা ইবরাহিম : ১২)।

যারা সত্যিকারের মুমিন এবং আল্লাহকে ভালোবাসেন তারই ওপর ভরসা করেন, দুঃখ-কষ্ট কিংবা হতাশায় তারা কখনো ভারাক্রান্ত হতে পারেন না। কারণ যারা মহান আল্লাহর পথের অনুসারী, তারই দ্বীনবিজয়ের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেন, দুঃখ-কষ্ট ও যাতনাকে বরণ করে নেন, তাদের জন্যতো মহান আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। কারণ আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তিনি মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আমাদেরও উচিত মহান আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করা। জেল-জুলুম, নির্যাতন-নিপীড়ন কিংবা রিজিক হারানোর ভয় যেন আমাদেরকে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা থেকে বিরত না রাখে। বরং ভয় শুধু আল্লাহকেই করা উচিত, কেননা তিনিইতো রিজিকের মালিক, তিনি ইচ্ছা করলে পাখির রিজিকের মতো কিংবা ধারণাতীত জায়গা থেকেও মানুষের জন্য উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করেন। আল কুরআনে এসেছে, "আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট" (সূরা ত্বালাক : ২-৩)। "আর আল্লাহর ওপর মুমিনগণ ভরসা করবে। ভরসা করা মুমিনদের উচিত" (সূরা ইবরাহিম : ১১)। নিশ্চয়ই যারা নিজেদের আল্লাহকে না

www.nagorikpathagar.org

দেখেও ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অতি বড় সাফল্য" (সূরা মূলক : ১২)। যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। (সূরা আনফাল : ২)। এ প্রসঙ্গে হজরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূল (সা) বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করার হক আদায় করতে তবে তিনি পাখিকে রিজিক দেয়ার মতোই তোমাদেরকেও রিজিক দিতেন। পাখিতো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে" (তিরমিজি)।

শুধু রিজিক কেন, জীবন চলার পথে সাফল্য পেতে প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সবার আগে আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত। কারণ আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তিনি সরাসরি বান্দাহকে সাহায্য করেন এবং ভরসাকারীদেরও ভালোবাসেন। সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তারপর আপনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আল্লাহর ওপরই ভরসা করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (তাঁর ওপর) ভরসাকারীদের ভালোবাসেন" আল্লাহর ওপর ভরসা করে সরাসরি সাহায্য পাওয়ার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরছি, যা রাসূল (সা)-এর হিজরতের সময় সাওর গুহায় ঘটেছিল। মক্কার কাফেররা যখন নবী (সা)-কে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তিনি শুধুমাত্র একজন সাথী হজরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশে বের হয়ে পড়েন। পথে সাওর নামক গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকা মক্কার কাফির বাহিনী খুঁজতে খুঁজতে একপর্যায়ে যে গিরিগুহায় রাসূল (সা) ও আবু বকর (রা) আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সেই সাওর গুহার মুখে পৌঁছে গেলো। হজরত আবু বকর (রা) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, দুশমনদের একজন যদি ভেতরে ঢুকে একটুও উঁকি দেয়, তাহলে তারা রাসূল (সা)-কে দেখে ফেলবে। কিন্তু রাসূল (সা) একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি হজরত আবু বকর (রা)-কে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন, "চিন্তিত হয়ো না, মন খারাপ করো না, অবশ্যই আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না কর, তাহলে কোনো পরোয়া নেই। আল্লাহ্ তাকে এমন সময় সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল, যখন সে ছিল মাত্র দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সাথীকে বলেছিল, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। সে সময় আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে তার ওপর মানসিক প্রশান্তি নাজিল করেন এবং এমন

www.nagorikpathagar.org

সেনাদল পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করেন, যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের বক্তব্যকে নিচু করে দেন। আর আল্লাহর কথা তো সমুন্নত আছেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়" (সূরা তওবা : ৪০)।

মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইবরাহিম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ এবং আগুন হতে সম্পূর্ণ অক্ষত থাকার ঘটনা ইতিহাসসমৃদ্ধ। সে সময়ও হজরত ইবরাহিম (আ) মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করেই আগুন থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে, তিনি বলেন, "ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন তিনি বললেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নি'মাল ওয়াকিল অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম অভিভাবক। আর লোকেরা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের বলল, (শত্রু বাহিনীর) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে, তাই তোমরা তাদের ভয় কর, তখন তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বলল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নি'মাল ওয়াকিল অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক" (বোখারি)। হজরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বোখারির আরেকটি বর্ণনায় আছে, আগুনে নিক্ষেপকালে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের শেষ কথা ছিল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নি'মাল ওয়াকিল (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম অভিভাবক)। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক আবু আলি ইবনে সিনা যেকোনো কাজে মহান আল্লাহর ওপরই ভরসা করতেন এবং কাজে সাফল্যও পেতেন। তিনি যখনই কোনো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখনই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতেন। জটিল বিষয় সমাধানকল্পে তিনি ছুটে যেতেন জায়নামাজে, দাঁড়িয়ে যেতেন নফল নামাজে আর দুই হাত তুলে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে বলতেন, "হে আল্লাহ তুমি আমার জ্ঞানের দরজাকে খুলে দাও"

আল্লাহর প্রতি ভরসা ছাড়া কোনো বান্দাই একটি মুহূর্তও অতিবাহিত করতে পারে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও বটে। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গাঢ় ও গভীর হয়। আল্লাহ্ বলেন, "আর ভরসা কর সেই জীবিত সত্তার (আল্লাহর) ওপর, যিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না" (সূরা ফুরকান : ৫৮)। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহর ওপরই ভরসা কর" (সূরা মায়েদা : ২৩)। তিনি আরও বলেন, "মুমিনগণ যেন একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করে" (সূরা তওবা : ৫১)। এ প্রসঙ্গে হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন কোনো ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে

www.nagorikpathagar.org

বের হওয়ার সময় বলে, আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম। খারাপ বিষয় থেকে ফিরে থাকা আর ভালো বিষয়ে সামর্থ্য রাখা আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়– তাহলে তাকে বলা হয়, তোমাকে সঠিক পথ দেখানো হলো, (আল্লাহই) তোমার জন্য যথেষ্ট হলো, তোমাকে রক্ষা করা হলো। আর তখন শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়" (আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসায়ি)। অপর একটি হাদিস উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত (তার মূল নাম হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া হুযায়ফা আল মাখযুমিয়্যাহ) (তিনি বলেন), নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজ ঘর থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, "আল্লাহর নামে বের হলাম, তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম। হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি, যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই আর আমাকে যেন পথভ্রষ্ট করা না হয়। আমার যেন পদস্খলন না হয় বা পদস্খলন করা না হয়। আমি যেন কারো ওপর অত্যাচার না করি বা কারো দ্বারা অত্যাচারিত না হই। আমি যেন মূর্খতা অবলম্বন না করি বা আমার সাথে মূর্খতা সুলভ আচরণ না করা হয়"

তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর ভরসার নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তি কখনো হতাশ হয় না, দুঃখকে লালন করে না। আশা ভঙ্গ হলে মুষড়ে পড়ে না। বিপদ-মুসিবত, লড়াই-সংগ্রাম-সঙ্কটে ঘাবড়ে যায় না। যে কোনো দুর্বিপাক, দুর্যোগ, সঙ্কট, বিপদ-মুসিবতে আল্লাহ তাআলার ওপরই দৃঢ় আস্থা রাখে। ঘোর অমানিশার অন্ধকারেও আশা করে উজ্জ্বল সুবহে সাদিকের। যত জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের ঝড়-তুফানই আসুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না। যেকোন পরিস্থিতিতে আল্লাহর ওপর ভরসাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়। আল্লাহর ওপর ভরসা করে, ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে যদি দৃঢ় কদমে আমরা লক্ষ্যপানের দিকে এগোতে পারি তাহলে নিশ্চয় আমাদের জন্য উজ্জ্বল সুবহে সাদিক অবশ্যম্ভাবী।

৩. সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব রাসূল (সা)-এর অনুসরণ করুন

সফলতা অর্জনের জন্য মানুষ বহু পদ্ধতি, বহু কৌশল অবলম্বন করে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সফল ব্যক্তিত্বদের অনুসরণ করা। সফল মানুষদের সবাই অনুসরণ করতে চায়। সফলতা যেখানে যে পদ্ধতিতে, মানুষ ছুটে চলে সেখানে, ধাবিত হয় সেই পদ্ধতি অনুসরণে। সফলতা মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। মানুষের সামগ্রিক কর্মতৎপরতাই সাফল্যের পেছনে ছুটে চলাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। তাইতো মানুষ খুঁজতে থাকেন সফল মানুষদের। পৃথিবীতে যারা সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তারা সকলের কাছেই গ্রহণীয়, বরণীয় এবং অনুসরণযোগ্য

www.nagorikpathagar.org

হয়েছেন। মানুষ অনুসরণ করতে চায় এমন ব্যক্তিত্বদের যাদের অনুসরণ করে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছা যায়।

সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছার জন্য আমরা কতই না সফল ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করি। কত শত সফল ব্যক্তির জীবনী পড়ি। নিজে পড়ি অন্যকেও তা পড়তে, অনুসরণ করতে বলি। মাঝে মধ্যে আমাদের পিতা-মাতাও এমন সফল ব্যক্তিদের কথা শুনিয়ে সে অনুযায়ী আমাদের পথ চলতে বলেন। আমরা আমাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে এমন অনেক ব্যক্তিত্বের লেকচার শুনেছি যাদের অনুসরণে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের জীবনী আলোচনা করে আমাদের মোটিভেশন চালানো হয়েছে। আমরাও হরহামেশা লেখনীতে, বক্তব্য বিবৃতিতে বহু সফল ব্যক্তিত্বের উদাহরণ টেনে অন্যকে উপদেশ দিই অনুসরণের। এই সকল উপদেশ, মোটিভেশন সফলতার পানে ছুটে চলা ব্যক্তির জন্য আশাব্যঞ্জক। কিন্তু নিরাশার দিক হলো, আমরা যাদের জীবনী পড়ে, যাদের সফলতার উদাহরণ টেনে সাফল্যের মোটিভেশন চালাই তাদের সফলতা জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকে না হয়ে কোন না কোন একটা দিকে তারা সফলতার স্বাক্ষর রাখলেও তারাই আমাদের গোটা জিন্দেগির অনুসরণীয় সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়ে যান।

আমাদের অনেকেরই টেবিলে এ ধরনের অনেক সফল ব্যক্তিত্বের বইয়ের সমাহার থাকে। একবার আমি আমার এক বন্ধুর টেবিলে সফল ব্যক্তিদের জীবনীমূলক অনেক বইয়ের স্তূপ দেখে কৌতূহলবশত সবগুলো বই হাতে নিয়ে দেখলাম। বিশ্বের নামীদামি অনেক সফল ব্যক্তিত্বের বই ছিল সেখানে। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম সফল ব্যক্তিত্ব এবং মনীষীদের এত্তসব বই সংগ্রহের উদ্দেশ্য কী? প্রত্যাশিত উত্তরই পেলাম তার কাছে, এসব সফল ব্যক্তিত্বের অনুসরণে জীবনটাকে সফল করতে, জীবনটাকে বদলে দিতে চায় সে। আমার বন্ধুটির কাছে জানতে চাইলাম আচ্ছা বন্ধু, সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব কে? যার জীবনে কোনো ব্যর্থতা ছিল না, যিনি সর্বক্ষেত্রেই সফল ছিলেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যাকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করা যায়? আমার বন্ধুটি কিছুক্ষণ চিন্তা করেই জবাব দিল এমন সফল ব্যক্তিত্বতো একজনই-তিনি হলেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। বন্ধুকে শেষ প্রশ্নটি করলাম সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে টেবিলে রাখা সফল ব্যক্তিদের বইয়ের সারিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সিরাতগ্রন্থ বা জীবনীমূলক বই নেই কেন? আমার বন্ধুটি এ প্রশ্নে খানিকটা বিব্রত হলো, মাথা নিচু করে বলল, আসলে বিষয়টিতো সেভাবে ভাবিনি।

www.nagorikpathagar.org

যিনি জীবনের সব দিকেই ছিলেন সফল, সব বিভাগেই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। যিনি তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন-বৃদ্ধ– সব বয়সেই অনুকরণীয়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। আমরা বিষয়টি শতভাগ মুখে স্বীকার এবং অন্তরে বিশ্বাস করলেও তাঁকে অনুসরণ করতে আমরা অনেকে ভুলেই যাই। তাঁর জীবনালেখ্য দিয়ে সফল জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে আমরা অনেকেই পিছপা হই। আমাদের বক্তব্য বিবৃতি লেখনীতে আমরা তাঁর উদাহরণ টেনে আনতে শঙ্কোচ বোধ করি। কী দুর্ভাগ্য আমাদের! আমাদের পিতা-মাতাও তাঁর জীবনী থেকে উদাহরণ আমাদের কমই দেন। শিক্ষকরা ক্লাসে যত বেশি পারেন বিভিন্ন সফল ব্যক্তিত্বের উদাহরণ দেন কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদাহরণ খুব কমই সামনে আনেন। তাহলে যাকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করি তাকে অনুসরণ না করে কিভাবে আমরা সফল হওয়ার কিংবা জীবন বদলে দেয়ার স্বপ্ন দেখি!

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবন। মানুষের জীবনের ব্যাপ্তি খুবই ছোট এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের। পৃথিবীর বয়স যত বাড়ছে মানুষের গড় আয়ু তত কমছে। ক্ষুদ্র জীবনেও সফল হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর সুন্দর স্বপ্ন আমাদের। ক্ষুদ্র এই জীবনে মানুষকে সফলতার সিংহাসনে আরোহণ করতে হলে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়। পার হতে হয় নানা সময়ে নানা সঙ্কট। জন্মের পর থেকেই মানুষকে প্রতিবন্ধকতা টপকাতে হয়। শিশু-কৈশোর, তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ– এই সব বয়সের গণ্ডিতে নানা বাধা প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়েই মানুষকে সফলতার স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। একটি কথা আছে, মানুষের জীবনের যত বাঁক, বাধা প্রতিবন্ধকতার তত হাঁক। এই বাধা প্রতিবন্ধকতার হাঁক-ডাক মাড়িয়েই মানুষকে সফলতার মঞ্জিলে পৌঁছতে হয়। কিন্তু যদি বলা হয় শিশু, কিশোর, তরুণ, যুবক, বিবাহিত জীবন, বৃদ্ধ এবং মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ধাপেই সফল ছিলেন শ্রেষ্ঠ ছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্বের নাম বলো। হিসাব করে বললে দেখা যায়, সচরাচর আমরা যাদের নাম বলি তারা কোনো একটি সময়ে কোনো একটি বয়সে কোনো এক বিষয়ে সফল ছিলেন। কিন্তু সব বয়সে সব সময়ে যিনি সফল ছিলেন, সবদিক থেকেই যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি হলেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত বীর-মহাবীর, নেতা-মহানেতা, রাজা-মহারাজা, সমাজসংস্কারক ও সফল ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে, এঁদের সবাই সভ্যতার বিভিন্ন অংশে অসামান্য অবদান রেখেছেন। পৃথিবীতে তাদের বহু অমর কীর্তি স্থাপিত হয়েছে তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এসব ব্যক্তি বহু

www.nagorikpathagar.org

জীবনদর্শন দিয়ে মানবজাতির উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। এসব সফল ব্যক্তির অনুসরণ করেও অনেকেই সফলতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছেন। কিন্তু সফল এসব ব্যক্তিত্বের অবদান, চেষ্টা-সাধনা ও কৃতিত্ব অনেকাংশেই পূর্ণতা পায়নি। বরং তা ছিল আংশিক, অপরিপূর্ণ, জীবনের কোনো একটি বিষয়ে, কোনো একটি সময়ে বা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ইতিহাসে হযরত মুহাম্মদ (সা) এমনই একজন মাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র সফলতা ও কৃতিত্ব দিয়ে মানবজীবনের জন্য আদর্শ হয়ে রয়েছেন। তাঁর সফলতার এ অবদান শুধু ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয়জীবন তথা সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সফল ব্যক্তিত্ব। একটি সুন্দর বসুন্ধরা বিনির্মাণে, একটি সফল ব্যক্তিত্বপূর্ণ জীবনগঠনে, পরিপূর্ণ অবদান, কীর্তি এবং দর্শন রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর জীবনেই।

অসংখ্য সফল ব্যক্তিত্বের জীবনী আমাদের সামনে রয়েছে। তাদের বহু সাফল্যের নজিরও রয়েছে আমাদের সামনে। কিন্তু এর কোনো একটিই মানুষের পরিপূর্ণ জীবনটাকে বদলায়নি। এর কোনো একটিই কোন ব্যক্তির জীবনে পূর্ণাঙ্গ সফলতা এনে দেয়নি। বরং প্রতিটি ঘটনাই আংশিক বা কিয়দংশ সফলতার মুখ দেখেছে। সফল ব্যক্তিদের প্রতিটি সাফল্যই ব্যক্তিকে পুরো না বদলিয়ে বা ভেতর থেকে না বদলিয়ে শুধু বাইরের পরিবেশটা বদলানোর চেষ্টা করেছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাফল্যের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো, মানুষ ভেতর থেকে বদলে গিয়েছিল। শুধু বদলে যায়নি বরং তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনে সংঘটিত হয়েছিল আমূল পরিবর্তন। রাসূলের অনুসরণে একটি জাহেলি সমাজ আমূল পরিবর্তন হয়ে কল্যাণমুখী সমাজে পরিণত হলো। হযরত ওমর (রা)-এর মত দোর্দণ্ড-প্রতাপশালী দাম্ভিক মানুষটি হয়ে গেলেন বিনয়ী সত্যনিষ্ঠ মানুষ। আওস এবং খাজরাজ গোত্রের দীর্ঘ ৪০ বছরের 'খুনকা বদলা খুনে'র নীতি পরিবর্তন হয়ে তারা হয়ে গেলেন পরস্পরের কল্যাণকামী। উচ্ছৃঙ্খল, মদখোর, হতাশ, যুবকেরা রাসূল (সা)-এর মত ব্যক্তিত্বের অনুসরণে বিলাসী জীবনের মুখে পদাঘাত করে আদর্শিক জীবনযাপন করতে শুরু করলেন। একটি বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এলো আলোকিত একটি সমাজ। এমন সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া আর কে হতে পারেন?

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফল এবং শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ছোটবেলা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূল (সা)-এর জীবনের প্রতিটি ধাপই আমাদের জন্য অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়। ছোটবেলায় শিশুদের মধ্যে রাসূল (সা) ছিলেন আদর্শ শিশু। কারণ তিনি কখনো খেলার ছলেও শিশুদের আঘাত

www.nagorikpathagar.org

করেননি। রাসূল (সা) যখন কিশোর বয়সে উপনীত হন তখন তিনি আরবের জাহেলি সমাজের চিত্র দেখে ব্যথিত হন। সে সময়কার গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ বিগ্রহসহ বিধ্বস্ত সমাজের করুণ চিত্র রাসূল (সা) উপলব্ধি করেন। কিশোর হওয়ার সত্ত্বেও তিনি সবাইকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। কিশোর হয়েও সফল হন তিনি। যুক্ত হন হিলফুল ফুজুল সংগঠনের সাথে। ২৫ বছর বয়সে আরবের ধনাঢ্য মহিলা হযরত খাদিজা (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হজরত খাদিজা (রা) ব্যবসার সকল দায়িত্ব রাসূল (সা)-এর ওপর অর্পণ করেন। রাসূল (সা) দক্ষতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন। রাসূল (সা)-এর হাত ধরে ব্যবসার ব্যাপক উন্নতি হয়। সে হিসেবে রাসূল (সা) একজন সফল ব্যবসায়ীও ছিলেন বটে। ৪০ বছর ধরে চলা আওস এবং খাজরাজ গোত্রের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান রাসূল (সা)। কাবাঘর মেরামতের সময় হাজরে আসওয়াদ কারা স্থাপন করবে এ নিয়ে সৃষ্ট সংঘাত ও উত্তেজনা রাসূল (সা) সফলতার সাথেই সমাধান করেন।

৪০ বছর বয়সে নবুওয়ত লাভের মাধ্যমে রাসূল (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব আরো বেশি উদ্ভাসিত হয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিটি জীবনেই রাসূল (সা) একজন শ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিজীবনে তিনি মহানুভব, পরোপকারী, দয়ালু, দানশীল ও হৃদয়বান। পারিবারিক জীবনে তিনি শ্রেষ্ঠ শিশু, শ্রেষ্ঠ কিশোর, শ্রেষ্ঠ যুবক, শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ পিতা। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একাধারে তিনি শ্রেষ্ঠ সফল রাষ্ট্রনায়ক, শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক, শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, শ্রেষ্ঠ সমরবিদ, শ্রেষ্ঠ কৌশলী, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী। মদিনায় রাষ্ট্রগঠনে রাসূল (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। মদিনা সনদ প্রণয়ন করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ী হয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তিনি সাফল্যের নব দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তিনি সাফল্যের ষোলোকলা পূর্ণ করেছেন। এভাবে তাঁর জিন্দেগির প্রতিটি ধাপের শ্রেষ্ঠত্ব ও সফলতা বর্ণনা করে সহজেই শেষ করা যাবে না।

রাসূল (সা)-এর সিরাত বা জিন্দেগি আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে পড়ি তাতে শুধু আবেগতাড়িত হই। কারো ক্ষেত্রে এ আবেগ রাসূল (সা)-কে জানতে উদ্বুদ্ধ করে মানতে নয়। এমন মুসলমানদের সংখ্যা নেহাত কম নয় যারা শুধু সওয়াব হাসিল করার জন্যই সিরাত তথা রাসূল (সা)-এর জীবনীচর্চার আগ্রহ পোষণ করে থাকে। কোথাও কোথাও খুবই ধুমধামের সাথে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, কোথাও মিষ্টি মন্ডা বিতরণ, কোথাও ফুলের ছড়াছড়ি, কোথাও আগরবাতি ও আতর-লোবানের মাত্রাতিরিক্ত ছড়াছড়ি এবং কোথাও বিচিত্র আলোকসজ্জা

www.nagorikpathagar.org

দ্বারা উক্ত বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি ঘটে। দুর্ভাগ্যবশত, এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেরণা নিয়ে রাসূল (সা)-এর জীবনী অধ্যয়ন করাতে আমরা খুব কমই সফল হচ্ছি। রাসূলের জীবনী থেকে জীবনের প্রতিটি ধাপের অনুসরণ করে তদনুসারে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে– এরূপ মনোভাব দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছি না। ফলে জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা সাফল্যও পাচ্ছি না। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষ হয়েও তিনি এমন অতুলনীয় সাফল্যমণ্ডিত জীবনের নমুনা পেশ করেছেন যা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর জীবনে ছিল অনেক গুণের সমাহার। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, তাঁর দৃঢ়তা-সাহসিকতা, নীতি-আদর্শ, কোরবানি-আত্মত্যাগ, দায়িত্বসচেতনতা, মানবতার সেবাসহ সামগ্রিক কাজই ছিল মানবতার কল্যাণে। তাইতো তিনি সফল হয়েছেন সর্বক্ষেত্রে, গড়েছেন এক পুণ্যময় জীবন যা আমাদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে রয়েছে এবং তাঁর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় আদর্শ রয়েছে।

আপনার প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে? এমন প্রশ্নের জবাবে বহু লোককেই দেখেছি যারা তাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেই বেছে নেন। কিন্তু সামগ্রিক জীবনে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ তারা অনুসরণ করেন না। তাদের জীবনাচরণ দেখলে সামান্যটুকুও বলার সুযোগ নেই যে, অমুকের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা)। এ সকল ব্যক্তি প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাসূলকে মনোনীত করেন ঠিকই কিন্তু তার জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন না। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনাদর্শ থেকে সমভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে একজন রাষ্ট্রনায়ক, একজন প্রশাসক, একজন শাসনকর্তা, একজন মন্ত্রী, একজন কর্মকর্তা, একজন মনিব, একজন চাকুরীজীবি, একজন ব্যবসায়ী, একজন শ্রমিক, একজন বিচারক, একজন শিক্ষক, একজন সেনাপতি, একজন বক্তা, একজন নেতা, একজন সংস্কারক, একজন দার্শনিক এবং একজন সাহিত্যিকও। সেখানে একজন পিতা, একজন সহযাত্রী ও একজন প্রতিবেশীর জন্য একই রকম অনুকরণীয় আদর্শ রয়েছে। মানুষ তার জীবনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম উৎকর্ষ অর্জন করা প্রয়োজন তার সবই আছে রাসূল (সা)-এর ব্যক্তিত্বে। এ জন্যই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব। সমগ্র মানবেতিহাসে অনুসরণীয় 'শ্রেষ্ঠমানুষ' কেবল এই একজনই।

রাসূল (সা) যে অনুকরণীয় অনুসরণীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তার ঘোষণা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূল (সা)-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ" (সূরা আহজাব : ২১)। রাসূল (সা) যে সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা সবসময়ই

www.nagorikpathagar.org

আলোচিত এবং স্বীকৃত। আল্লাহ্ মানুষের হেদায়েতের জন্য পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। মুসলমানতো বটেই, দুনিয়ার প্রায় সব অমুসলিম মনীষী, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক, গবেষক সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তি হিসেবে সাইয়েদুল মুরসালিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের বক্তব্য বিবৃতি লেখনীতে। বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত দার্শনিক জজ বার্নার্ড শ রাসুল (সা) এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, **I believe that if a man like Mohammad (peace be upon him) was to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness.** অর্থাৎ- আমার বিশ্বাস নবী মুহাম্মদ (সা) এর মতো কোন ব্যক্তি যদি বর্তমান বিশ্বের একনায়কের পদে আসীন হতেন, তাহলে তিনিই বর্তমান বিশ্বের সমস্যাবলীর এমন সমাধান দিতে পারতেন, যার ফলে বিশ্বে কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি নেমে আসত। আজকের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে সফল জীবন গঠন করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রকৃত অনুসরণের বিকল্প নেই।

৪. পরকালীন সফলতাই প্রকৃত সফলতা

সফলতা কে না চায়? সুস্থ বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই সফল হতে চায় আপন কর্মে আপন ক্ষেত্রে। যেখানেই সে বিচরণ করে, সেখানেই সফলতা অর্জন করতে চায়। এ সফলতা ব্যক্তি, ক্ষেত্র, লক্ষ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সফলতা অর্জনে দু'ধরনের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। একটি হলো ব্যক্তিগত সফলতা আর অপরটি হলো সমষ্টিগত বা দলগত সফলতা। সফলতা অর্জনের জন্য মানুষ বহুভাবে চেষ্টা করে থাকে। মেধা, শ্রম, সময়, সম্পদ সবকিছুই মানুষ সাফল্য অর্জনে বিনিয়োগ করে। কিন্তু যে সাফল্য অর্জনের পেছনে মানুষের এতো চেষ্টা-প্রচেষ্টা সেই সফলতার ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজের বেশির ভাগ মানুষই সাফল্য অর্জনের সময় এবং ক্ষেত্র শুধু দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করে। অথচ প্রতিটি মানুষই মরণশীল, মৃত্যুর পরেও একটি জীবন আছে, যে জীবন অনন্তকালের। সে জীবন সম্পর্কে জেনেও পরকালীন সফলতার হিসাব কেউ করে না। ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগির জন্য মানুষ যতটা না সময় শ্রম অর্থ ব্যয় করে তার সিকিভাগও যদি মানুষ পরকালীন সফলতার জন্য ব্যয় করতো তাহলে মানুষের ইহকালীন সফলতার পাশাপাশি পরকালীন সফলতাও নিশ্চিত করা যেত। কারণ পরকালীন সফলতাই প্রকৃত সফলতা।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের জন্য মৃত্যু অবধারিত, এটি মহাগ্রন্থ আল কুরআনেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, "প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে" (সূরা আনকাবুত : আয়াত ৫৭)। আর মৃত্যুর পরেই মানুষের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। হিসাব করা হবে মানুষ সফল না ব্যর্থ। দুনিয়ার জীবনে বহু সফলতা অর্জনকারীও সেদিন ব্যর্থ হবে কারণ দুনিয়ার সফলতাই চূড়ান্ত সফলতা নয়। মানুষ তার জীবনকে খন্ডিত চিন্তা না করে যদি আখিরাতকে নিয়েই চিন্তা করে তাহলে প্রকৃত সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি অগ্রসর হতে পারবে। মানুষের প্রকৃত সফলতা কিন্তু দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতেই নিরূপণ করা হবে। দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতেই যে চূড়ান্ত সফলতা অর্জিত হবে তার নাম জান্নাত আর ব্যর্থতার পরিণাম জাহান্নাম। দুনিয়ার জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, তাই এর সফলতাও ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত সফলতা হচ্ছে আখেরাতের সফলতা। তাই কেউ যদি আখেরাতের অনন্ত অসীম জীবনে সফলতা ও মুক্তি না পায়, তাহলে দুনিয়াতে সে যতই সুখ বিলাসিতা ও আরামে কাটাক না কেন, সে সফল নয়। আর যদি কোনো মুমিন দুনিয়ার অস্থায়ী ও স্বল্পকালীন জীবনটাকে কষ্টের ভেতর দিয়েও কাটায়, কিন্তু আখেরাতে সে জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতরাজি লাভ করে, তাহলে সে-ই সফল। হজরত আবু বকর (রা) বলেন, "যারা আখেরাতের অন্বেষায় দুনিয়াকে একেবারে পরিত্যাগ করে বসে তারা সফলকাম নয়; বরং দুনিয়া ও আখিরাতে যারা সমভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয় তারাই সর্বাপেক্ষা সফলকাম মানুষ"

শুধু বৈষয়িক কল্যাণ বা সফলতাই প্রকৃত সফলতা বা কল্যাণ নয়। এমনও তো হতে পারে যে, এক ব্যক্তি চূড়ান্ত গুমরাহির ধারক-বাহক ও পথপ্রদর্শক হয়েও দুনিয়ার জীবনে নানা ধরনের অপকর্ম করে খুবই সফল জীবন উপভোগ করবে। সবাই হয়তো তাকে সবচেয়ে সফল ব্যক্তি বলেই বিবেচনা করবে। আর প্রতি মুহূর্ত ফুলে ফলে বিকশিত হবে তার যাবতীয় অপকর্ম। কিন্তু তার এ সফলতা প্রকৃত সফলতার পরিচয় বহন করে না। বরং তার যাবতীয় কর্মতৎপরতা চরম ব্যর্থতার চূড়ান্ত দলিল। নৈতিক মানদন্ডে সে একজন অপরাধী। দুনিয়াতে অপরাধীকে আল্লাহ সাময়িক কালের জন্য অবকাশ দিয়ে থাকলেও পরকালে অবশ্যই তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী, "আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন" (সূরা নাহল : ৬১)। দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্যে সফল এই ব্যক্তিটিই পরকালীন জিন্দেগিতে অপরাধী হিসেবে শাস্তি পাবে। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তুমি বল! আমি যদি আমার প্রতিপালকের নাফরমানি করি, তাহলে ভয় করছি এক বড় (ভয়াবহ) দিনে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে

www.nagorikpathagar.org

হবে" (সূরা আনআম : ১৫)। তিনি আরো বলেন, "তারা কি চিন্তা করে না, একটি মহাদিবসে তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে? যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে" (সূরা মুতাফ্‌ফিফিন : ৩-৪)। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনটিকে মহাদিবস হিসেবে উপস্থাপিত করে বলা হয়েছে, সেদিন আল্লাহর আদালতে সকল জিন ও মানুষের হিসাব নেয়া হবে এবং একই সঙ্গে শাস্তি ও পুরস্কার দানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা করা হবে অথচ এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই গাফেল। কুরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "বল! এটা এক মহা সংবাদ, যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ" (সূরা সোয়াদ : ৬৭-৬৮)। কাজেই পরকাল-উদাসীন ব্যক্তির বৈষয়িক উন্নতিই সফলতার মাপকাঠি নয়। সফলতা লাভকারী সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন, "সেদিন যে ব্যক্তি শাস্তি থেকে রেহাই পাবে, আল্লাহ্ তার ওপর বড়ই অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই হলো সুস্পষ্ট সাফল্য" (সূরা আন'আম : ১৬)।

পরকালে মহাদিবসে প্রতিটি মানুষকেই তার দুনিয়ার জিন্দেগির হিসাব দিতে হবে। সেদিন প্রশ্ন করা হবে না কে জিপিএ-৫, কে গোল্ডেন-৫ পেয়েছো, কে ডাক্তার হয়েছো, কে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছো বরং সেদিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কোনো মানবসন্তানকে এককদমও সামনে এগোতে দেয়া হবে না। এ প্রসঙ্গে হজরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল (সা) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আদমসন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এককদমও স্বস্থান থেকে নড়তে দেয়া হবে না। ১) তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে, ২) যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৩) ধনসম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে, ৪) তা (ধন সম্পদ) কিভাবে ব্যয় করেছে, ৫) সে দ্বীনের যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কি না" অপর একটি হাদিসে এসেছে– হজরত আবু হুরাইয়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, "যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন মহান আল্লাহ সাত ধরনের লোককে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন– ১. সুবিচারক বাদশাহ, ২. ঐ যুবক যার যৌবন আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে, ৩. সেই নামাজি ব্যক্তি যার মন সদা মসজিদে আবদ্ধ থাকে এমনকি সে মসজিদ থেকে ফিরে আসার পর পুনরায় মসজিদে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল থাকে, ৪. ঐ দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে অর্থাৎ যাদের একত্র হওয়া এবং বিচ্ছেদ হওয়া আল্লাহকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে, ৫. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে, ৬. যে ব্যক্তি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কোনো সুন্দরী যুবতী দ্বারা (প্রেম নিবেদনে) আহূত হয়ে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৭. আর যে ব্যক্তি এমন

www.nagorikpathagar.org

গোপনে দান করে যে তার ডান হাত কী দান করল বাম হাত তা জানে না" (বুখারি ও মুসলিম)।

মানুষ যে পথে যে উদ্দেশ্যে নিজের যাবতীয় শ্রম, মেধা, অর্থ ও যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা নিয়োজিত করে, পরিণামে যখন জানতে পারে যে, সেই পথ তাকে সোজা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে- যে পথে সে তার যাবতীয় মূলধন ও যোগ্যতা নিয়োজিত করেছে, এ পথে সে কোনোক্রমেই সাফল্য অর্জন করতে পারবে না বরং উল্টো তাকে মহাক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাহলে এই ধরনের ব্যক্তির তুলনায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত বা অধিক ব্যর্থ আর কে হতে পারে? বর্তমানে যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে কৃত্রিম সফলতা অর্জনের পথে যাবতীয়-কিছু বিনিয়োগ করছে, তাদের অবস্থাও অনুরূপ। পরকাল হবে না এবং পৃথিবীর জীবনের কোনো কর্মের হিসাব কারো কাছে কখনোই দিতে হবে না। এই চিন্তা-বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করেছেন, বৈধ-অবৈধের কোনো সীমা এরা মানেনি, যেকোনো পথে ধনসম্পদ অর্জন ও ব্যয় করেছে, জীবন-যৌবনকে দ্বিধাহীনচিত্তে আকণ্ঠ ভোগ করেছে, এসব লোকই পরকালীন জীবনে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেসব লোক, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্ভাবনাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে" (সূরা ইউনুস : ৪৫)।

এই পৃথিবীতে মানুষ পরকালভিত্তিক জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হলেই কেবলমাত্র সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। কারণ একমাত্র পরকালের ভয় তথা পৃথিবীর যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এই অনুভূতিসম্পন্ন লোকদের পক্ষেই এই পৃথিবীকে একটি শান্তির নীড় হিসেবে গড়া সম্ভব। আর যাদের ভেতরে সেই অনুভূতিই নেই, তারাই মানবসমাজের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং এরাই হলো সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ব্যর্থ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেসব লোক, যারা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার খবরকে মিথ্যা মনে করেছে" (সূরা আনআ'ম : ৩১)। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিই সব থেকে সফলতা অর্জন করলো, যে ব্যক্তি তার গোটা জীবনকালব্যাপী আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে নিজের জীবন পরিচালিত করলো তথা সূরা আসরে বর্ণিত চারটি গুণ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করলো। যদিও সে ব্যক্তি পৃথিবীতে চরম অভাবের ভেতরে জীবন অতিবাহিত করেছে তবুও সে তার স্রষ্টা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সফলতা ও কল্যাণ অর্জন করেছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা আসরে উল্লেখ করেন, "সময়ের কসম, নিশ্চয়

www.nagorikpathagar.org

মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে" মোট কথা, পরকালে যারা সফলতা অর্জন করতে পারবে কেবলমাত্র তারাই সফল হবে আর পরকালে যারা ব্যর্থ হবে, তারাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত এবং এটাই স্পষ্ট দেউলিয়াপনা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, "বলো প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার, পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভালো করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা" (সূরা আয্ যুমার : ১৫)। আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে" (সূরা আশ শূরা : ৪৫)।

পরকালে বিশ্বাস স্থাপনের তাৎপর্য এই যে, যিনি পরকাল বিশ্বাস করে তার এমন এক মনমানসিকতা গড়ে ওঠে যে, সে প্রতিটি মুহূর্তে অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখে যে, তার প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য কর্মকান্ড রেকর্ড হচ্ছে এবং মৃত্যুর পরের জগতে এ সম্পর্কে তাকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। মহান স্রষ্টা তার ওপরে যে প্রহরী নিযুক্ত করেছেন, তার দৃষ্টি থেকে কোনো কিছুই গোপন করা যাবে না। সে যদি কোনো অপরাধমূলক কর্ম করে থাকে তাহলে এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে– এ বিশ্বাস তার ভেতরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলেই সে যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। আর যারা পরকাল অবিশ্বাস করে অথবা পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, তাদের চরিত্র হয় পরকাল বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, পরকাল বলে কিছুই নেই সুতরাং তাদের কোনো কর্মের ব্যাপারে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। পৃথিবীর জীবনে তারা যদি অবৈধভাবে জীবন-যৌবনকে ভোগ করে, অপরের অধিকার খর্ব করে অর্থসম্পদের স্তূপ গড়ে, দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের জন্য দেশ ও জাতির ক্ষতি করে, জাতীয় সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে, ক্ষমতার বলে অধীনস্থদের অপরাধমূলক কর্মে জড়িত হতে বাধ্য করে, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে স্বৈরাচারী নীতি অবলম্বন করে দেশের জনগণের কণ্ঠরোধ করে, সাধারণ মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করে তাদেরকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করে– তবুও তারা ভয়ের কোনো কারণ অনুভব করে না। কারণ তারা এ বিশ্বাসে অটল যে, মৃত্যুর পরে তাদের এসব হীনকর্মের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সাক্ষী, এই পৃথিবীর বুকে এমন বহু জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করার পরও পরকালে জবাবদিহির

www.nagorikpathagar.org

অনুভূতি না থাকার কারণে তারা নিমজ্জিত হয়েছে নৈতিক অধঃপতনের অতল তলদেশে। পরকাল অবিশ্বাসের কারণে তারা নৈতিক অধঃপতনের অন্ধকার বিবরে প্রবেশ করে ন্যায়ের শেষ সীমা যখন অতিক্রম করেছে, তখনই তারা আল্লাহ্ তা'য়ালার গজবে নিপতিত এই পৃথিবী থেকে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। পরকাল বিশ্বাস অন্যায়কারীর কণ্ঠে জিঞ্জির পরিয়ে দেয়, ফলে সে অন্যায় পথে অগ্রসর হতে পারে না অন্যায় পথ অবলম্বনকারীরা নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদেরকে করেছে অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্থ এবং আঘাতে আঘাতে তাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছে, ফাঁসির রশি তাদের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়েছে। বর্তমানেও এদের উত্তরসূরিদের আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই শ্রেণীর লোক পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল এবং উদগ্র কামনা-বাসনাকে দমন করতে অতীতে যেমন রাজি ছিল না বর্তমানেও রাজি নয়। নিজ দেশের জনগণ বা ভিন্ন দেশের জনগণকে নিজেদের গোলামে পরিণত করে তাদের ওপরে প্রভুত্ব করার কলুষিত কামনাকে এরা নিবৃত্ত করতে আগ্রহী নয়। নিজের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ও পরকালের প্রতি যথার্থ বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই হলো মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণ। এদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ্ বলেন, "প্রকৃত বিষয় এই যে, যারা আমার সাথে আখিরাতে মিলিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখতে পায় না এবং পৃথিবীর জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে, তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, ঐসব কৃতকার্যের বিনিময়ে যা তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি অনুসারে করেছে" (সূরা ইউনুস : ৭-৮)।

মহান আল্লাহর কাছে মানুষের চেষ্টা ও কর্মের বিনিময় লাভ নির্ভর করে দুটো জিনিসের ওপর। প্রথম হলো, মানুষের সমস্ত চেষ্টা-সংগ্রাম ও কর্মসাধনা হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে। আর দ্বিতীয়টি হলো, এই চেষ্টা-সংগ্রাম ও কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাপদেশে পৃথিবীর পরিবর্তে আখিরাতের সাফল্যই হতে হবে প্রধান ও চরমতম লক্ষ্য। যে উদ্দেশ্যে কর্ম পরিচালিত হয়, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল করে দেন এবং দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা কোনোরূপ কৃপণতা করেন না। কেউ যদি লোক দেখানোর জন্য, সম্মানের জন্য কিংবা শুধুমাত্র দুনিয়ার সাফল্যের জন্য কোনো কর্মপ্রচেষ্টা চালায় মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে দুনিয়াতেই যেসব অর্জন করিয়ে দেন। তার এ অর্জন আখেরাতে সফলতার জন্য কোনো ভূমিকা রাখবে না। কারণ তার যা কাম্য

www.nagorikpathagar.org

ছিল, আল্লাহ পৃথিবীতেই তা দিয়ে দেন। সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড যাদের জানা ছিল না বা যারা পৃথিবীর জীবনে সম্মান-মর্যাদা ও বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়াকেই প্রকৃত সফলতা বলে বিশ্বাস করতো, তারা ধারণা করতো, লোকটি বড়ই সফল ব্যক্তি- লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। তারা আক্ষেপ করে বলতো, আমরাও যদি লোকটির অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারতাম! ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত এই মূর্খ লোকগুলোর মূর্খতা দেখে হকপন্থীরা তাদেরকে বলতো, "তোমরা যাকে সফলতা বলে ধারণা করছো তা সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতা হলো মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আমলে সালেহ্ করা। আর ঈমান আনা ও আমলে সালেহ্ করা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ধৈর্যশীল" হকপন্থীরা কিভাবে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছিল, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলেন, "কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলতে লাগলো, তোমাদের অবস্থা দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারে না" (সূরা কাসাস : ৮০)।

মানুষের ভেতরে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, অর্থসম্পদ ও বিত্তবৈভবের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, অর্থসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই হলো সম্মান এবং মর্যাদার মানদন্ড- এই ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে সূরা আল ফজর-এর ১৭ থেকে ২০ নম্বর আয়াতসমূহে। ১৭ নম্বর আয়াতের প্রথম শব্দটিতেই বলা হয়েছে, 'কাল্লা' অর্থাৎ কখনো নয় বা এমনটি নয়। অর্থাৎ তোমরা যে ধারণা অনুসারে অর্থসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকেই সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র মানদণ্ড বানিয়ে নিয়েছো, তা সত্য নয়। এসব বিষয় সম্মান ও অসম্মানের মানদন্ড কখনো হতে পারে না। কোন ব্যক্তির চরিত্র উন্নত না নিকৃষ্ট, তা বিবেচনা না করেই এবং এর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা বিচার-বিবেচনায় না এনে একমাত্র অর্থসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকেই সম্মান-মর্যাদা ও অপমানের মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছো, এটা তোমাদের মারাত্মক ভুল ধারণা আর বুদ্ধির দৈন্যতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। দুনিয়াতে যেসব ছাত্র পরীক্ষা দেয় তারা পরীক্ষার রেজাল্ট পায়। মার্কশিটে প্রত্যেক বিষয়ের নাম্বার লেখা থাকে। সার্টিফিকেটে লেখা থাকে সে কোন গ্রেডে পাস করেছে। আখিরাতেও প্রত্যেকে নিজের আমলনামায় সবকিছু লেখা পাবে। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন, "আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কেয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (এবং তাকে বলা হবে) পাঠ কর তোমার কিতাব! আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট" (সূরা বনি ইসরাইল : ১৩-১৪)।

www.nagorikpathagar.org

সেদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলনামা দেখবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে। চাই তা ভালো হোক বা মন্দ। সেদিন তারা কামনা করবে যে, এ দিনটি যদি তাদের নিকট হতে অনেক দূরে অবস্থান করতো; তবে কতোই না ভালো হতো" (সূরা আলে ইমরান : ৩০)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলেন, "সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো কিছু গোপন থাকবে না" (সূরা আল হাক্কাহ : ১৮)। মানুষ আমলনামা দেখে অবাক হয়ে যাবে। কারণ আমলনামায় ছোট বড় সব কিছু লেখা থাকবে। কে কখন কাকে সামান্য উপকার বা ক্ষতি করেছে, কে কখন সামান্য নেকি বা বদির কাজ করেছে সব কিছুই দেখতে পাবে। নিজের আমলনামা দেখে অপরাধীরা বলার চেষ্টা করবে, এসব অপরাধ আমি করিনি। ফেরেশতারা অতিরিক্ত লিখেছে। তখন আল্লাহ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে, তোমরা সাক্ষী দাও। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে এবং সবকিছু খুলে বলবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবোতা তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে" (সূরা ইয়াসিন : ৬৫)।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার ঘাম, শ্রম, ত্যাগেরই হিসাব বিশ্লেষণ করে সফলতার মাপকাঠি নিরূপণ করা হয়। কিন্তু সমষ্টিগত সফলতা অর্জনে দলের প্রত্যেকেরই প্রচেষ্টার খতিয়ান পর্যালোচনা করে সফলতা নিরূপণ করা হয়। সমষ্টিগত কোনো সাফল্য অর্জনে দলের সবারই প্রচেষ্টা কম বেশি থাকে। যখন সমষ্টির কোনো একজন দলগত সাফল্যে যথেষ্ট ভূমিকা না রাখেন তখন তার ব্যর্থতা সাফল্যের হাওয়ায় ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় কম প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তিটিও সফল। বিপরীত দিকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও দলের কোনো ব্যক্তি যদি তার সর্বোচ্চ উজাড় করে দিয়ে চেষ্টা করেন তাহলে ব্যক্তি হিসেবে সমষ্টির ভেতর তিনি অবশ্যই সফল। যারা দ্বীন বিজয়ের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করেন তারা যদি তাদের সর্বোচ্চ উজাড় করে দিয়ে দ্বীন বিজয়ের জন্য ভূমিকা রাখেন তাহলে দ্বীনের সাফল্য অর্জিত হোক বা না হোক ব্যক্তি হিসেবে নিশ্চিতভাবে তিনি সফল। কারণ দ্বীনের সাফল্য অর্জনের কর্মপ্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। তার এই প্রচেষ্টার ফলাফল হচ্ছে তিনি পরকালীন জিন্দেগিতে জান্নাতের অধিকারী হবেন। আবার দ্বীন বিজয় হয়ে গেল কিন্তু ব্যক্তি দলের সাথে থেকেও তার জান্নাত অর্জন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলেন তাহলে তার গোটা জিন্দেগিটাই ব্যর্থ। কারণ আখিরাতের ব্যর্থতাই চূড়ান্ত ব্যর্থতা আর আখিরাতের সফলতাই চূড়ান্ত সফলতা। মহান আল্লাহ আমাদেরকে পরকালীন সফলতা তথা জান্নাত-উপযোগী মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করার তাওফিক দিন, আমিন।

www.pathagar.com

গ্রন্থসূত্র

১. তাফহীমুল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রহ.- আধুনিক প্রকাশনী।
২. সহীহ আল বুখারী- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ.- আধুনিক প্রকাশনী।
৩. সহীহ আল মুসলিম- ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ.- আধুনিক প্রকাশনী।
৪. মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সা.- নঈম সিদ্দিকী- শতাব্দী প্রকাশনী।
৫. রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন- আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই- খায়রুন প্রকাশনী।
৬. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা- ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ- বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
৭. তুমিও জিতবে- শিব খেরা- নদী প্রকাশনী, ঢাকা।
৮. মোরা বড় হতে চাই- ড. আহসান হাবীব ইমরোজ- আইসিএস পাবলিকেশন্স।
৯. পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন- অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খান- প্রফেসরস পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
১০. ক্যারিয়ার বিকশিত জীবনের দ্বার- সংকলন সম্পাদনা- আইসিএস পাবলিকেশন্স।
১১. জীবন চলার সঠিক পথ- মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.- নাদিয়াতুল কোরআন প্রকাশনী।
১২. মনটাকে কাজ দিন- অধ্যাপক গোলাম আযম-কামিয়াব প্রকাশনী
১৩. কুড়ানো মানিক- মাওলানা মুহিউদ্দিন খান- মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা
১৪. জীবন সৌন্দর্য- ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
১৫. ইসলাম আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন- এ এম এম সিরাজুল ইসলাম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
১৬. শ্রেষ্ঠ রচনা সমগ্র- ডা. লুৎফর রহমান- সোলেমানিয়া বুক হাউস
১৭. **THE 100- Michael H Hart- Genius Publications**|
১৮. রিয়াদুস সালেহীন- ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আন নববী (র.)- খায়রুন প্রকাশনী।
১৯. ইসলামী আন্দোলনঃ সাফল্যের শর্তাবলী- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রহ.- আধুনিক প্রকাশনী।
২০. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান- নঈম সিদ্দিকী- আধুনিক প্রকাশনী।
২১. **Easy lessons in Einstein- Emulsion- Dhaka ebook**|
২২. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান- ড. মরিস বুকাইলী- আল কুরআন একাডেমি লন্ডন।
২৩. মুসলিম যুবসমাজের ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন- আবদুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ- সবুজপত্র।
২৪. **Think and Grow Rich- Nepoleon Hill- Dhaka Book Shop** ।
২৫. জীবন যৌবন সাফল্য- আবদুস শহীদ নাসিম- শতাব্দী প্রকাশনী।
২৬. তরুণ তোমার জন্য- আজম ওবায়েদুল্লাহ- ওয়ামী বুক সিরিজ
২৭. হাদিসের আলোকে মানব জীবন- মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসুফ- খেলাফত পাবলিকেশন্স।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একবার আমি আমার এক বন্ধুর টেবিলে সফল ব্যক্তিদের জীবনীমূলক অনেক বইয়ের স্তূপ দেখে কৌতূহলবশত সবগুলো বই হাতে নিয়ে দেখলাম। বিশ্বের নামীদামি অনেক সফল ব্যক্তিত্বের বই ছিল সেখানে। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম সফল ব্যক্তিত্ব এবং মনীষীদের এতসব বই সংগ্রহের উদ্দেশ্য কী? প্রত্যাশিত উত্তরই পেলাম তার কাছে, এসব সফল ব্যক্তিত্বের অনুসরণে জীবনটাকে সফল করতে, জীবনটাকে বদলে দিতে চায় সে। আমার বন্ধুটির কাছে জানতে চাইলাম আচ্ছা বন্ধু, সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব কে? যার জীবনে কোনো ব্যর্থতা ছিল না, যিনি সর্বক্ষেত্রেই সফল ছিলেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যাকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করা যায়? আমার বন্ধুটি কিছুক্ষণ চিন্তা করেই জবাব দিল এমন সফল ব্যক্তিত্বতো একজনই-তিনি হলেন সর্বশেষ নবী মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা)। বন্ধুকে শেষ প্রশ্নটি করলাম সত্যই যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে টেবিলে রাখা সফল ব্যক্তিদের বইয়ের সারিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সিরাতগ্রন্থ বা জীবনীমূলক বই নেই কেন? আমার বন্ধুটি এ প্রশ্নে খানিকটা বিব্রত হলো, মাথা নিচু করে বলল, আসলে বিষয়টিতো সেভাবে ভাবিনি।

যিনি জীবনের সব দিকেই ছিলেন সফল, সব বিভাগেই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। যিনি তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন-বৃদ্ধ- সব বয়সেই অনুকরণীয়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব।

...তাহলে যাকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করি তাকে অনুসরণ না করে কিভাবে আমরা সফল হওয়ার কিংবা জীবন বদলে দেয়ার স্বপ্ন দেখি!

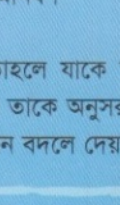

ISBN : 978-984-34-4240-6